আলোর মানুষ

সঞ্জীব দেবলস্কর

আলোর মানুষ

সঞ্জীব দেবলস্কর

অক্ষর পাবলিকেশানস্
প্রধান কার্যালয় : জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা-৭৯৯০০১
কলকাতা কার্যালয় : ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-৭০০০১২

alor manush
(a bengali novel by sanjib deblaskar)

আলোর মানুষ: সঞ্জীব দেবলস্কর

© পুষ্পিতা দেবলস্কর, শাশ্বত দেবলস্কর

ISBN No-978-93-84079-14-7

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রচ্ছদ ঃ পুষ্পল দেব

অক্ষর সংস্থাপন ও মুদ্রণ ঃ ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স, জে বি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা

❒

অক্ষর পাবলিকেশনস্-এর পক্ষে শুভব্রত দেব কর্তৃক জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা এবং ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ থেকে একযোগে প্রকাশিত।

আগরতলায় নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র : বইঘর অক্ষর জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা-৭৯৯০০১

কলকাতা কেন্দ্র : ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা- ৭০০০১২

১২ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট (দ্বিতল) কলকাতা - ৭৩

দিল্লি কেন্দ্র : ১২/ডি, নিউ সীমাপুরী, নতুন দিল্লি-১১০০৯৫

সার্বিক যোগাযোগ

অক্ষর পাবলিকেশানস্, সঞ্জীব ভিলা, জে বি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা-৭৯৯০০১

email : jraksharpub@gmail.com

visit us : www.aksharagartala.com

দূরভাষ ঃ (০৩৮১)-২৩০-৭৫০০/৯৪৩৬১২১১০৯ / ৮৭৩১০৫৫২৭৯

মূল্য ❒ ২২৫ টাকা

উৎসর্গ

বরাক উপত্যকার চার জাগ্রত বিবেক

শ্রী বিনোদলাল চক্রবর্তী,

শ্রী আবিদ রাজা মজুমদার

শ্রী সতু রায়

শ্রী দিলীপকুমার দে

মাননীয়েষু

ভূমিকা

আলোর মানুষঃ আলোর রাখাল

ভুলে থাকা ইতিহাসের কথা যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরাই আত্মঘাতী প্রজন্মকে পথ দেখান। সেই পথ যা কাঁটাগুল্মের সন্ত্রাসে হারিয়ে যায় না। তবে আলো থাকে শুধু আলোর শুশ্রূষায়, আলোর আবিষ্কারে। ইতিহাস তৈরি হয় আলোর মানুষদের অবিরাম প্রয়াসে; অথচ রাষ্ট্রতন্ত্র ও রাজনৈতিক সমাজের তিমিরাশ্রয়ী তৎপরতা এই সত্যের উপরে দুর্ভেদ্য ঝরোখা চাপিয়ে দেয়। কিন্তু মিথ্যা ও বিভ্রম দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না কখনও। আলোর রাখালেরা বিরল, তবু তাঁরা হার মানেন না। আলোর মানুষদের প্রতি তর্জনি সংকেত করে তাঁরা জীবনের শুশ্রূষা করেন; ইতিহাস-আচ্ছন্ন করা ঝরোখা সরিয়ে দেন। পৌর সমাজকে অবশ-করে রাখা তন্দ্রার ঘোর কেটে যায় আলোর বন্দনায়। সঞ্জীব দেবলস্কর বরাক উপত্যকায় সেই আলোর রাখাল। তাই নষ্ট-ধস্ত-দীর্ণ সময় তাঁকে অভিভূত করতে পারেনি। তিনি লিখেছেন সেই আলোর মানুষের কথা যাঁর নাম প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামী যাঁর নিরন্তর এষণায় বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতি এবং শিবরাত্রির সলতে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বীজাধান হয়েছিল। আজকের উন্মার্গগামী সময় স্মৃতি-সত্তার তাৎপর্য বোঝে না বলেই কলম-যোদ্ধা সঞ্জীব দেবলস্করকে এগিয়ে আসতে হয়। উদভ্রান্ত বহুর হয়ে বুঝিবা একাই প্রায়শ্চিত্ত করেন তিনি।

কী ভাবে একটু একটু করে উপত্যকায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি জনগণের আন্দোলনে রূপায়িত হল, এই বৃত্তান্ত না-জানা অন্তত কোণঠাসা বাঙালির পক্ষে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। কেননা সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক নিরিখে বৃহত্তর বঙ্গভূমির পূর্বপ্রান্তিক পরিসর হিসেবে গণ্য একদা-সুব্বুঙ্গবর্ষ অবিভক্ত কাছাড় থেকে বরাক উপত্যকা অভিধায় স্থিত। তা কখনও কোনো কারণেই আগ্রাসনবাদী আসামের অঙ্গ ছিল না। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি থেকে অভ্যন্তরীন উপনিবেশবাদী শক্তি, সবারই চক্ষুশূল বাঙালি। নইলে এখানে ১৯৬১ সালের ১৯ মে, ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট এবং ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় বাংলাভাষীকে শহিদের মৃত্যু বরণ করতে হত না। আর, ধর্মান্ধ কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিদ্বেষসর্বস্ব রাজ্য সরকারের লাগাতার চক্রান্তে ও পীড়নে অন্তরে-বাহিরে রিক্ত মেরুদণ্ডহীন বাঙালি এমনভাবে লেজুড়বৃত্তিতে অভ্যস্ত হত না। রাষ্টপ্রধান যেখানে নির্লজ্জ ভাবে

মিথ্যাশ্রয়ী, রাজ্যিক প্রশাসনের কর্তা এসে জো-হুজুরদের চাটুকারিতায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার ইতিহাসকে প্রকাশ্যে বিকৃত করবেই। কিন্তু পৌরসমাজ যখন বোবা ও বধির, সঞ্জীব দেবলস্করের মতো আলোর রাখালকেই এগিয়ে আসতে হয় দাম্ভিক অত্যাচারীর মিথ্যাভাষণকে পরাভূত করার জন্য। বহুশতাব্দি আগে সন্ত অগাস্টিন ‘The Confession’ (Book-II, XXIII: 1944) বইতে যেমন লিখেছিলেন, সেই উচ্চারণ হতে পারে সঞ্জীবেরওঃ ‘I see time as in some way extended. But do I only seem to see it? Thou wilt show me, O Light, O Truth’! হ্যাঁ, এই আলোর কাছে, সত্যের কাছে সঞ্জীবও দায়বদ্ধ, যেমন ছিলেন প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামী এবং তাঁর সমকালীন আলোর মানুষেরা।

এই বয়ান যখন লিখছি, দেশজুড়ে দানব-পিশাচের অবাধ দৌরাত্ম্য। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্য উন্মুল, অরাজক মিথ্যার তাণ্ডব। বিশেষভাবে বাঙালি জাতির সার্বিক মগজধোলাই সম্পন্ন হয়ে গেছে। বাঙালিকে যে-অপশক্তি চিরশত্রু গণ্য করে, তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গরা পায়ের তলায় ইতিহাসকে মাড়িয়ে যাচ্ছে বিনা বাধায়। যদি আলাদাভাবে ‘বরাক’ উপত্যকার বাংলাভাষীদের কথা ভাবি, দেখব অথৈ বিষাদসিন্ধু। পৌরসমাজ শ্যাওলা ধরা পাথরের মতো নিশ্চল রাজনৈতিক সমাজের দাপাদাপিতে। নইলে কি আর নিঃশব্দে হিন্দি ও অসমিয়া আধিপত্যবাদের কাছে বিনাদ্বিধায় আত্মসমর্পণ অব্যাহত থাকে? নিজেদের ইতিহাসকে নিজেই নস্যাৎ করে? তবু নরকের আঁধির মধ্যেও আঙুলে-গোনা কয়েকজন মাত্র জেগে থাকেন সঞ্জীব দেবলস্করের মতো, অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায়। ইতিহাস-হননের একতরফা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ান হাতের কলমকে শস্ত্রের মতো ব্যবহার করে। তিনিই স্মরণ করিয়ে দেন, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে-ওঠায় গণশত্রুদের ভূমিকা নেই কোনো। আজ নির্লজ্জ বাঙালি-বিদ্বেষীরা যদি ইতিহাসের সত্যকে পালটে দিতে চায়, উড়ে এসে জুড়ে বসা নেপোদের নির্বিঘ্নে দই চেটেপুটে খাওয়াকে প্রত্যাখ্যান করার মতো কাণ্ডজ্ঞান ও সাহস তো থাকা উচিত। ভয়ে এবং প্রাপ্তির লোভে যারা আপস করে, আমাদের লড়াকু পূর্বজরা তো সেই ভীরুদের দলে ছিলেন না। কিন্তু এ কথাটাও দৃঢ়স্বরে বলার লোক নেই।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণে যত কূটাভাসই থাকুক, সবদিক দিয়ে পিছিয়ে-থাকা বরাক উপত্যকায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি জোরালো হয়ে ওঠার পেছনে বড়ো স্বপ্ন সক্রিয় ছিল। স্বপ্নের সেই প্রতীক কেন পরবর্তীকালে ঝাপসা হয়ে গেল, তার বিশ্লেষণ জরুরি নিশ্চয়। তবে আপাতত স্বপ্ননির্মাণ-কথা যেভাবে আখ্যান রচনার

শৈলীতে উপস্থাপিত করেছেন সঞ্জীব, তা-ই বরং জেনে নিই আমরা। আর পড়তে পড়তে অবাক হয়ে ভাবি, প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামীর মতো 'স্বপ্নদর্শী' আলোর মানুষ কীভাবে সর্বগ্রাসী কূপমণ্ডুকতা উপেক্ষা করে এই মাটিতেই চিরহরিৎ বৃক্ষের উপমা হয়ে উঠেছিলেন। সঞ্জীবের লেখার প্রসাদগুণে আমাদেরই পরিচিত সমস্ত মানুষেরা চলমান 'ইতিহাস-কথা'র কুশীলব হয়ে উঠেছেন। একটু একটু করে যখন অম্লান ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি তৈরি হচ্ছিল, আমরা যারা কাছাকাছিই ছিলাম, লক্ষই করিনি 'ভবিষ্যৎ অতীত'-এর সম্ভাব্য উদ্ভাসনের সাক্ষী থাকছি। স্বপ্নের নীড় নির্মাণেও চাই বাস্তব উপাত্তের খড়কুটো। আর, চাই সঞ্জীব দেবলস্করের মতো একজন স্বল্পবাক নব্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস যিনি কোনো-এক আপৎকালে আত্মবিস্মৃত জনপদে নতুন স্বপ্নমঙ্গল-সংহিতা প্রণয়ন করবেন। এই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে কারা কেন বিশল্যকরণী বিবেচনা করেছিলেন, তা জানলে আমাদের সামূহিক আত্মবিস্মৃতির ঘোর কাটবে কি?

তবে এই প্রশ্ন প্রতিবেদকের, সঞ্জীবের কাছে নয়, নিজেরই কাছে। এ কথাই লিখব শুধুঃ আলোর রাখাল ছাড়া অন্য কেউ আলোর মানুষকে শনাক্ত করতে পারে না-প্রাপ্য মর্যাদাও দিতে পারে না। আর, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় কোনও সহজলভ্য বাজারের ঢোল নয় যে শক্তিদর্পীরা এসে তাতে চাঁটি মেরে যাবে। যার শিলা তার নোড়া তারই ভাঙি দাঁতের গোড়াঃ এই যাদের নীতি, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের কবলমুক্ত করতে হলে সঞ্জীবের বইটি পড়তেই হবে। কেবলমাত্র তখনই তিমিরভেদী আলো জেগে উঠবে ঘরে ঘরে...।

২১ জানুয়ারি, ২০২১ **তপোধীর ভট্টাচার্য**

শিলচর

লেখকের কথা

আবহমান বাংলার মানচিত্র থেকে ছিটকে পড়া 'নির্বাসিতা ভূমি' এ বরাক উপত্যকা দেশবিভাগ-পরবর্তী রাজনৈতিক কূটচালে পর্যবশিত হয়েছে এক অভিশপ্ত ভূমিতে। এখানকার জনগণের নাগরিক, ভাষিক বৈধতাকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে রেখে বিগত সাতটি দশক যে জটিল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড রচিত হয়েছে, এতে গাঙ্গেয় সমভূমির সম্প্রসারিত উত্তরাংশ এ খণ্ডিত বাংলার আত্মপরিচয় আজ বিস্মৃতির মুখে। বিশ শতকে কুড়ির দশকে আসাম বিধান পরিষদে "সিলেট এবং কাছাড়' রি-ইয়নিয়ন বিল"-এর প্রত্যাখ্যানলগ্নে যে দুর্যোগের আভাস দেখা গিয়েছিল, সাতচল্লিশে দেশভাগ, ষাট-একষট্টির, এবং অতঃপর ছিয়াশির ভাষা আন্দোলনে এর চরম প্রকাশ। স্বাধীনতা-উত্তর এই প্রান্তিক বঙ্গভাষীর প্রত্যয়, প্রস্তুতি এবং প্রতিরোধ নিয়ে সাম্প্রতিক এ অখ্যান। একটি সময়কে ধরে রাখা প্রান্তিকায়িত বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের এ সন্দর্ভ বরাক উপত্যকার চলমান আন্দোলনের একটি খণ্ডিত পর্ব বৈ তো নয়।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য অতি ধৈর্য সহকারে পাণ্ডুলিপি পড়ে বইটির একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। আগরতলার 'অক্ষর পাবলিকেশানস'-এর কর্ণধার শুভব্রত দেব উৎসাহের সঙ্গে বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন। এ বই লেখার জন্য তৈমুররাজা চৌধুরী, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, পরিতোষ দত্ত এবং প্রশান্ত গোস্বামীর ব্যস্ততম মুহূর্তে মাঝে মাঝে আমার অনুপ্রবেশ তাঁদের কাজের বিস্তর বিঘ্নও ঘটিয়েছে। এদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বিশিষ্ট কথাকার কুমার অজিত দত্ত (গৌহাটি) আমাকে নানা ভাবে উৎসাহ জুগিয়েছেন। তাঁর প্রতিও আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। সুদূর ইংল্যন্ড থেকে কন্যা সমতুল শ্রীমতী সুমাভা বিশ্বাস আমার কাজের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে নিরন্তর তাগিদ দিয়ে গেছে। তাঁকে আশীর্বাদ জানাই।

আমার একশো এক বছর অতিক্রান্ত শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অমরেশ দত্ত মহাশয় মৃত্যুর (৬ আগস্ট, ২০২০) কিছুদিন আগে দূরভাষে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'তোমাদের সমাজ-ইতিহাস-ভাষা-শিক্ষা বিষয়ক লেখাগুলোর পাঠক হলেন একাডেমিকসের লোক, পণ্ডিতকূল। কিন্তু ওই একই বিষয় নিয়ে সৃজনশীল রচনা লিখলে বিষয়টি আরও অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছোবে।' তাঁর অভিমত, মহাকাব্যের যুগ এখন নেই, এ যুগের সর্বব্যাপী মাধ্যম হল উপন্যাস। নিজের প্রসঙ্গ টেনেই তিনি আশি বৎসর বয়সে স্বয়ং উপন্যাস লেখার কথা বলেন। আমাদের সৌভাগ্য আমরা তাই পেয়েছি বিখ্যাত উপন্যাস 'বানপ্রস্থ'। স্যারের উদ্দেশে আমার বিনম্র প্রণাম।

শিলচর **সঞ্জীব দেবলস্কর**

রেলগাড়ির কামরায় বিমর্ষচিত্তে বসে আছেন ক'জনা। যে উৎসাহ নিয়ে আপার আসামের জোড়হাট শহরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন, সে উৎসাহ একেবারে স্তিমিত। টিম লিডার প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামী গাড়ির ভেতর ফুরফুরে হাওয়ায় তরতাজা হয়ে মনের সব গ্লানি ঝেড়ে মুছে ফেললে বললেন,

'কী হল? প্রভাতবাবু, আজকে চায়ের তৃষ্ণা নেই দেখি? শক্তিপদবাবু, উঠে বসুন। আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা আসছে। একটু আলোচনা করা যাইতে পারে। তবে এদের একটু সতেজ করা দরকার' বলে আঙুল দেখালেন সহযাত্রীদের দিকে। শক্তিপদ মুখে হাসি নিয়ে বললেন,

'আসলে বিষয় নির্বাচনী সভায় ওঁদের দাপট আর একরোখামো দেখে করুণাদা একেবারে হতাশ। এখনও ওঁর মাথাটা ঠাণ্ডা হয়নি।'

'মাথা ঠাণ্ডা হবার কথাও নয়। এরা সর্বভারতীয়। পারলে আন্তর্জাতিক হইতেও অসুবিধা নেই। অসুবিধা কেবল কাছাড়কে নিয়া একটি বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণে।' এই বলে বেঞ্চের উপর আসন করে বসলেন কবি করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য, 'এই সব জানলে কে যাইত এই সাহিত্য সম্মেলনে?' চোখ থেকে চশমাজোড়া খুলে রুমাল দিয়ে ভালো করে মুছতে মুছতে বললেন, 'আমি একটা হার্টের রোগী, তবু এত ধকল সহ্য করেও গেছি। বাঙালিদের এত বড় সমাবেশে বাঙালির সমস্যাটা যদি তুলে ধরা যায়।'

অধ্যক্ষ প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামী বুঝলেন, আলোচনার প্রেক্ষিত তৈরি হয়ে গেছে। আসলে জোর করে কোন কিছু করা যায় না, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজে থেকেই সব হয়ে ওঠে। তিনি ভাবছিলেন এই আলোচনা কী ভাবে শুরু করা যায়। সম্মেলনের হালচাল দেখে তাঁর মনে যে ভাবনাটা জেগে উঠেছে, এটা যদি আপাতত তাঁর সহযাত্রীদের ভাবনার সঙ্গে মিশে যায়, তবেই বিষয়টি এগোবে। তিনি অবশ্য নিজের ভাবনা অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে রাজি নন। ছাত্রজীবন থেকে তিনি তো সংগঠন করেই আসছেন। সেই মদনমোহন কলেজে থাকাকালীন গুপ্তসমিতি, স্বদেশি আন্দোলন, বিয়াল্লিশের ভারতছাড় আন্দোলনের দিন থেকেই।

দেড়দিন রেল ভ্রমণে নিজেদের অজান্তেই সবার মনের ভেতর একটি সুপ্ত বীজের অঙ্কুরোদ্গম হতে চলেছে। একটি নিজস্ব সংগঠন। সর্বভারতীয় সম্মেলন তার নিজস্ব ধারায় চলবে। এতে এই প্রান্তিক বাংলার আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটার সুযোগ নাও থাকতে পারে, এ নিয়ে আক্ষেপ বা দোষারোপ করার কোনও কথা নেই। দেশের প্রদেশে প্রদেশে ছড়ানো অসংখ্য ছড়ানো ছিটানো ইউনিট নিয়ে এ মহাসম্মিলন। এখানে একশোটি প্রস্তাবের মধ্যে আমাদের এই অন্যভুবন, মানে এই একটুকরো বাংলার জন্য বড়জোর দুইটি প্রস্তাবের সংস্থান হতে পারে। একাদশ ভাষা শহিদের কথাটি ওঁদের সঠিকভাবে বোঝাতে পারলে তবেই তো দ্বিতীয়টির সংস্থান। নইলে একটি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। প্রেমেনবাবু ধীরে ধীরে বাক্যগুলি উচ্চারণ করলেন,

‘আমাদের প্রয়োজন এমন একটি সংগঠন যেখানে সর্বমোট দশটি প্রস্তাব উত্থাপিত হলে এগুলোর প্রথম এবং শেষ অভিমুখই হবে আমাদের শহিদের ভূমি।’

চিন্তাটি যেন নিজে থেকেই একটা পরিণতির দিকে এগোচ্ছে। প্রভাত চন্দ বললেন,

‘আগে তো কদাপি এমনটি ভাবি নাই। আমাদের নিজস্ব সাহিত্য সংগঠন। এর পরিধি হবে শিলচর, হাইলাকান্দি আর করিমগঞ্জ।’

‘কী আশ্চর্য! এই চিন্তাটি আরও আগে তো আসতে পারত। ইস! কত দেরি হয়ে গেছে।’ বললেন করুণারঞ্জন।

প্রেমেন্দ্রবাবুর মুখে হাসি, ‘চিন্তা জিনিসটা আকাশ হইতে নামিয়া আসে না। কোনও একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই চিন্তার উদ্ভব হয়। প্রাত্যহিক জীবনযাপনে অভ্যস্থ মানুষের মাথায় চিন্তা আসার কথা নয়। কিন্তু এই একই মানুষ যখন কোনও একটা বড়ো কাজে সামিল হয়, তখনই তাঁর মনের মধ্যে নতুন পরিকল্পনা আসে, কর্মপদ্ধতির রূপরেখাও তৈরি হয়। ইংরেজিতে এটাকে বলে এক্টিভেশন অব ক্রিয়েটিভ থট প্রসেস।’ সবাই নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যক্ষ মহোদয়ের কথা শুনলেন।

'এরকম সাহিত্য সংগঠনের চিন্তা এ অঞ্চলে একেবারে অভিনব কিছু নয়।' প্রেমেন্দ্রবাবুর কথার সূত্র ধরে করুণারঞ্জন বললেন, 'শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ, মুসলিম সাহিত্য পরিষদ, সুরমা সাহিত্য পরিষদ—এসব আমাদের ছিল। অভিশপ্ত দেশবিভাগ এসে সব তছনছ করে দিয়েছে।'

শক্তিপদর ঘুমের রেশ কেটে গেছে। একটা সিগেরেট হলে মন্দ হত না, কিন্তু এদের সামনে তো আর-। তিনি উদাস হয়ে তাকালেন জানালার দিকে। পাহাড় লাইনের অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা, গাড়ির দোলা, চারিদিকে অবিশ্রান্ত শব্দরাজি, শঙ্খধ্বনির মতো ইঞ্জিনের হর্ন, আকাশে আকাশে ছড়ানো ইঞ্জিনের ধুঁয়া। এ যেন এক পূজার আয়োজন। হঠাৎ অকারণ পুলকেই মনটা খুশিতে মেতে উঠেছে। সব কথা কানে যাচ্ছে, অথচ কিছুই যেন শুনছেন না। এ হল শক্তিপদর আরেক ভালোবাসার ব্যস্ততা। প্রেমেনবাবুদের কথাগুলো যেন রামধনুকের মতো নানা রঙের ঝলকানি দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। কলিকাতি খ্যাপাটে কবিবন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ক'টি পঙক্তি মনে এল-

> শব্দ মানেই দুই দিকে তার মনটি থাকে বিশ্বজুড়ে
> রামধনুকের মতন রঙিন সার্বজনীন পন্থ জুড়ে
> যেমন চলে নদী এবং ... (কী যেন--মনে পড়ছে)
> ধারাবাহিক মনের ক্ষত...।

প্রেমেনবাবুদের কথাগুলো কেমন যেন কবিতার শেষ কথাগুলোর সঙ্গে মিশে গেল, -'ধারাবাহিক মনের ক্ষত...।' ইচ্ছে হল পঙক্তিগুলো জোরে জোরে উচ্চারণ করি। কিন্তু তিনজন প্রবীন ব্যক্তির সিরিয়াস আলোচনার মাঝখানে বেমক্কা কাব্যি করার ধৃষ্টতা নেই শক্তিপদর। এবারে সবার দৃষ্টি পড়ল তাঁর দিকে।

'আমরা তো একটা সাহিত্য সংগঠন বানানোর কাজ বেশ এগিয়ে ফেলেছি। আপনার ঘুম তো অনেকক্ষণ ভেঙে গেছে। কী ভাবছেন? নতুন কোনও কবিতা?'

'না, না স্যার, আমি যে কথাগুলো মাঝে মাঝেই ভাবি, এগুলো একেবারে গুছিয়ে এসেছে আপনাদের চিন্তায়। আমি সবই শুনছি।' শক্তিপদ বেঞ্চের উপর পা মুড়ে বসলেন।

প্রেমেন্দ্রবাবু জানেন নিরবচ্ছিন্ন একটা চিন্তাধারাকে সংহত করতে হলে একটু বিরতি দিতে হয়। নইলে তাবৎ সব অসম্ভব পরিকল্পনা এসে প্রয়াসটিকে দিকভ্রষ্ট করে দেয়।

পরিবেশটাকে হাল্কা করতে তিনি বললেন, 'শক্তিপদ, আপনি কী কবিতা নিয়ে গেছিলেন? পড়েছেন তো নিশ্চয়ই। আমার শোনা হয়নি। এখন শুনে নেব, কী বলেন প্রভাতবাবু, করুণা?'

উপরে বাঙ্কে গভীর ঘুমের ভান করে শুয়ে আছেন অশোক বার্মা। ইশকুলে শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে কবিতা লেখার সখ। কবিতার কথা শুনে তিনি নড়ে চড়ে বসলেন। তাঁরও গোপন খাতায় ইতিমধ্যে হিন্দি আর বাংলায় অনেকগুলো কবিতা জমে গেছে। সম্মেলনে গিয়েও কবিতা পড়ার ইচ্ছেটাকে দমিয়ে রাখলেন। কেন কে জানে?

শক্তিপদ বুঝেছেন প্রেমেন্দ্রবাবু কবিতা না শুনে থামবেন না। আপাত দৃষ্টিতে কঠোর প্রকৃতির মানুষ হলেও প্রেমন্দ্রবাবুর বুকের ভিতর একটা বাউল কবি লুকিয়ে আছে। সেন্ট্রাল রোডে 'কমলা বুকস্টলে' নতুন কবিতার বই এলে তিনি হাওয়ায় গন্ধ পান। নীরেন চক্রবর্তী, তারাপদ রায়, সুনীল-শক্তি, বিষ্ণু দে, উৎপল বসু -এদের নিখুঁত পরিপাটি করে ছাপা, বাঁধাইয়ের বইগুলো তিনি নেবেনই। তাঁর 'সময় শরীর হৃদয়' এর এক কপিও তিনি নিয়ে গেছেন, শক্তিপদ খবর পেয়েছেন। এ বইয়ের কয়েকটি কবিতা নিয়ে শিলচর শহরে ঢিঁ ঢিঁ পড়েছিল—অধ্যাপক হয়ে কী অশ্লীল কবিতা লিখেছেন শক্তিপদ! নিন্দুকেরা বলে, 'জমির মিঞাঁর জবানবন্দি'তে শক্তিপদ অশ্লীলতার একশেষ করেছেন। করুণারঞ্জনের এসব তো বিলকুল অপছন্দ। শক্তিপদর এটা হচ্ছে আঞ্চলিক বাক্যের প্রয়োগে আসর জমানোর কায়দা। কেন? তাঁর নিজের কবিতায়ও তো আঞ্চলিক বাকভঙ্গি এসেছে— 'বাবু বিড়ি জ্বইলা যায়, সুখটান দেওয়া হইল না'। আঞ্চলিক মানেই কি অশ্লীলতা? শক্তিপদর এগুলো কি জনসমক্ষে পাঠ করা যায়? নিজেই কী ক'রে পাঠ করবেন 'গণ্ডা কতক—পেলে একটু ঠাণ্ডা হতে পারি/ ছিচরণের দাসানুদাস শক্তিপদ ব্রহ্মচারী'? করুণারঞ্জন রীতিমতো ঘেমে উঠেছেন এসব ভাবতে ভাবতে। প্রেমেন্দ্রবাবু সব জানেন, সব বুঝেন। কিন্তু তাঁর কাছে কাছে ওসব সমালোচনা, কুৎসা প্রশ্রয় পায়নি। প্রেমেনদার এসব ব্যাপারস্যাপার

কেমন যেন বেখাপ্পা লাগে করুণারঞ্জনের। দাদা ডাকি তো, কিছু বলতেও পারি না।

শক্তিপদর পকেট থেকে বেরোল ছোট্ট কবিতাটি। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বাঁহাত দিয়ে মাথার চুল ঠিক করতে করতে উচ্চারণ করলেন—

কয়েক সহস্র পাঠকের সামনে একটি কবিতা
তুলে ধরবার মতো কোন মুখপত্র নেই—
আমার সমস্ত চেতনা ভালোবাসার প্রচণ্ড শব্দগুলি
কয়েকজন বন্ধুর মুখের মতো করুণ
কয়েকজন বান্ধবীর মুখের মতো নিস্পৃহ
কয়েকজন স্তাবকের আলোচনার মতো অসহায়
সম্মিলিত কারুণ্য, নিস্পৃহতা ও অসহায়ত্বের
কোন মুখপত্র নেই—
এই প্রগাঢ় ঋতুর সাহিত্য-বাসরে
ধূপকাঠির জ্বালানো গন্ধ, রবীন্দ্রনাথের ছবি,
মাননীয় সভাপতি ও উপস্থিত বিদগ্ধমণ্ডলী
আমার বলতে না-পারার অক্ষমতা ক্ষমা করবেন
কিছু পাঠকের অসহায় মুখের মতো
কবিতাকেও মাঝে মাঝে অসহায় মনে হয়।

২

একাদশ শহিদের রক্তের বিনিময়ে কাছাড়ে বাংলা ভাষার একটা সংস্থান হলেও এটা যে খুব স্বস্তিকর, তা মনে হচ্ছে না। মূল দাবি ছিল সমগ্র রাজ্যে দ্বিতীয়ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি এবং সে সঙ্গে অন্যান্য মাঝারি, ক্ষুদ্র ভাষিকগোষ্ঠীর অধিকারেরও স্বীকৃতি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী মহোদয়ের মধ্যস্থতায় একটা গ্রহণযোগ্য ত্রিভাষা সূত্রের মাধ্যমে রাজ্য যা এসেছে তা হল একটা স্থিতাবস্থা। এটা যে সবার জন্য খুব স্বস্তিকর নয়, তা ক্রমে ক্রমে বোঝা গেল। বাংলা ভাষাকে অসমিয়া ভাষার সম-মর্যাদা না দিলে আসামের বাংলা

ভাষাভাষী এলাকাকে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যে অপরিহার্য, এটা সেই ষাট সালেই উচ্চারিত হয়েছিল কাছাড় জেলার একটি গ্রাম, নরসিংহপুরে ঐতিহাসিক রাজমোহন নাথের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত যোগী সম্মেলনীর এক অধিবেশনে।

কাছাড়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মনে দৃঢ়তার বড় অভাব। একবার দপ করে জ্বলে উঠেই আবার নিস্প্রভ। ছেলেমেয়েদের চাকরি নেই, উন্নয়নপ্রক্রিয়া সব আটকে গেছে, জমি বন্টন, সরকারি ঋণ, এমনকী ছাত্রবৃত্তি প্রদানেও নানা বাধা বিপত্তি, এ নিয়ে কারো মুখে টু শব্দটি নেই। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বিচক্ষণ নেতৃত্বের বড় অভাব। আর হবেই না বা কেন, যাঁদের পেছনে ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা, এরা ক্রমে কোণঠাসা হয়ে গেলেন। কংগ্রেসে যে নতুন নেতৃত্ব এলেন এদের অন্যতম নেতা তো সেদিনই ছিলেন জিন্নার অনুগামী, আর হাইলাকান্দির যে জমিদার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শায়েস্তা করতে পাঠিয়েছিলেন লাঠিয়াল, তাঁকেই বহাল করা হল নেতৃত্বে। সামান্য একটি লাইসেন্স, কোনও কমিটির সদস্যপদ লাভ করেই মাঠ ফাঁটানো কংগ্রেসকর্মী নিশ্চুপ। কামিনীকুমার চন্দ, রাশিদআলী লস্কর, রমণীমোহন দাস, যতীন্দ্রমোহন দেবলস্কর, সতীন্দ্রমোহন দেব, সনৎ দাস, অরুণকুমার চন্দের যুগ অবসানে কাছাড়ের নেতৃত্বে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হল।

ওদিকে স্বাধীনতার তিনমাস পরই যে-মন্ত্রিসভা রাজ্যপালকে দিয়ে বাঙালিকে দরজা দেখিয়ে দেয় এদের সঙ্গে কি করে সম্পর্ক রাখা যায়? লোকপ্রিয় বরদলুই অনুমোদিত স্যার আকবর হায়দরির ভাষণে তো কোন রাখঢাক না করেই বলা হল, 'বাঙালিরা এখন হীনবীর্য, এরা ইচ্ছে থাকলেও পাহাড়ে আর সমতলে নিজস্ব আধিপত্য জাহির করতে পারবে না।' বলা হল 'অসমিয়ারা এখন নিজ রাজ্যের অধিপতি, 'মাস্টার্স অব দেয়ার ওন ল্যান্ড।' খোদ রাজ্যপালের মুখে এমন ধরনের ভাষণ এ দেশে কোথাও কোনও দিন কি উচ্চারিত হয়েছে? শুধু কি তাই? বাঙালিদের বলা হল আগন্তুক, 'স্ট্রেঞ্জার্স'। তবে এদের প্রতি যেন মানবিক আচরণ করা হয়, এও বলা হল। অবশ্য সেটাও শর্তসাপেক্ষে। বিনিময়ে বাঙালিদের যা করতে হবে তা হল আনুগত্য প্রদর্শন।

কই সেদিন তো এর প্রতিবাদে একজনও খাড়া হলেন না? বাঙালির স্বাধীনতা তো সেদিনই কেঁড়ে নেওয়া হল। এটা কি প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, কিংবা

কংগ্রেস সভাপতি কারো কানে পৌঁছোয়নি? সাহস করে কথাগুলো ওদের কানে তো কেউ পৌঁছেও দেয়নি। সেই আনুগত্য প্রদর্শনের ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। দেশবিভাগ নিয়ে বাঙালির কাঁদুনি আর দোষারোপ তো আছেই, কিন্তু এই যাঁদের ঘোষিত নীতি, এদের সঙ্গে তো দিব্যি মিলে মিশেই থাকলেন এরা। এমতাবস্থায়ই ষাট সালের অক্টোবর মাসে এই দলীয় সহকর্মীরাই দিলেন এক জব্বর পদাঘাত। এক তরফা পাশ করিয়ে নিলেন রাজ্য ভাষা আইন। এতে সংস্থান নেই অন্য কোন ভাষার।

স্বাধীনতার আগে কাছাড় ছিল যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির আওতায়, সেটা তো এ জেলার স্বতন্ত্র ভাষিক চরিত্রলক্ষণের জন্যেই। এটা যেন সবাই ভুলেই গেলেন। আর যে অংশকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া গেল না, সে অংশকে যে কার্যত পদানত করে রাখার বন্দোবস্ত করা হল, এটা দেখেও কেউ দেখলেন না। কেন্দ্রীয় শাসিত 'পূর্বাচল রাজ্যে'র দাবিটাকে এরাই নস্যাৎ করে দিলেন। এর পর আবার রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন আসামে এলে 'কাছাড় কল্যাণ সমিতি'র হাতেগোনা কতিপয় ব্যক্তি পূর্বাচলের বিরোধিতা করলেন। কিন্তু আশ্চর্য, সাবেক পূর্বাচল দাবির স্মারকলিপিতে কাছাড়ের গ্রাম এবং শহরের হিন্দু, মুসলিম, বাঙালি, ডিমাসা, মণিপুরি, হিন্দুস্তানি সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় ১৭ জন ব্যক্তিই স্বাক্ষর করেছিলেন। কিন্তু হায়! এবার মুষ্ঠিমেয় চার পাঁচ জনের বিরোধিতায়ই এটা নাকচ হয়ে গেল।

বাহাত্তরে রাজ্যের রাজধানী শহরসহ স্বতন্ত্র একটি রাজ্য নিয়ে আলাদা হয়ে গেল খাসি পাহাড়। এদের আর রাজ্যভাষা আইনের আওতায় থাকতে হচ্ছে না। বড়ো জনগোষ্ঠীও তাদের অঞ্চলে নিজ ভাষার সুরক্ষার আশ্বাস পেলেন। সেটা অবশ্য কাছাড়ের মতই।

একষট্টির ছাত্রনেতা পরিতোষ পালচৌধুরী এই স্থিতাবস্থাকে কোন মতেই মানতে রাজি নন। তিনি এখানে ওখানে সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন এই ভাষার সুরক্ষা তো শর্তাধীন। প্রচুর ফাঁকফোঁকর আছে এখানে। আজ না হোক কাল এ পথ দিয়ে আঘাত আসবেই আসবে। কাছাড়বাসী নিশ্চিন্তে ঘুমালে একদিন ছোঁ মেরে রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই অধিকারও কেঁড়ে নেবে ওরা। পরিতোষ বোঝানোর চেষ্টা করছেন, যে-প্রবল শক্তি নিয়ে রাজ্য বিধান সভায়

একটা অন্যায্য, অসাংবিধানিক বিল পাশ করিয়ে নিল, ওঁদের এ শক্তি এতটুকুও ক্ষয় হয়নি। সময় সুযোগ পেলেই আবার এরা ক্ষমতা প্রদর্শন করবে। কী প্রয়োজন এ ভাবে একটি স্থায়ী বিবাদ টিকিয়ে রাখার? কাছাড়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র ইউনিয়ন টেরিটোরিই তাঁর মতে এ সমস্যার সমাধান। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় থাকুক না অসমিয়া ভাষা। বাঙালিরা চাইলে সংবিধান মতে ওখানে তো থাকতে পারবে, যেমন দেশের অপরাপর রাজ্যে রয়েছে। ওঁদের সমস্যা তো কাছাড় নিয়েই। দিয়ে দিক না আলাদা করে। তখন আর কেউ ওদের ভাষার অধিকারে ভাগ বসাতে আসবে না। আর ব্যাপারটা শুধু ভাষাই নয়। সার্বিক উন্নতির ব্যাপারও তো রয়েছে। রয়েছে শরনার্থী পুনর্বাসনের দিকটিও। রাজ্য সরকারের সহযোগিতা না পেলে কেন্দ্রীয় সরকার শরনার্থীদের জন্য কিছুই তো করতে পারবে না, পারছেও না। এ খাতে যে অর্থ আসছে এসব কোথায় যাচ্ছে? গ্রামে গঞ্জে একষট্টির অন্যতম সমর্থক নন্দকিশোর সিংহকে নিয়ে পরিতোষ জনমত গঠন করার প্রবল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ব্যক্তিটি শিলচর রেলস্টেশনে গুলির প্রতিবাদে বিধান সভার সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। তাঁর স্বপ্নও কাছাড়ের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আসামের সঙ্গে থাকলে এটা সম্ভব নয়।

ওঁরা দেখতে পাচ্ছেন, একষট্টির সেই লড়াকু মানসিকতা ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে আসছে। আর আসবে না'ই বা কেন? উনিশের আত্মবলিদানের একমাস পরই লেগে গেল ভ্রাতৃদাঙ্গা। কার চক্রান্তে, কারা শহরের বুকে প্রকাশ্য দিবালোকে লুণ্ঠন, রক্তপাত, অগ্নিসংযোগ করতে এল? বাংলা বুলিতেই অসমিয়া ভাষার জয়ধ্বনি। গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচা টাকা, আকাশে উড়ল হাজারে বিজারে লিফল্যাট। গ্রাম শহরের বিভাজন বাড়াতে নানা ধরনের চক্রান্তের জাল বিছানো হল কাছাড়ে। সংগ্রাম পরিষদকে ভেতরে বাইরে দুর্বল করে অস্তিত্বহীন করে দেওয়ার অপপ্রয়াস হল জোরদার।

একদিন হাইলাকান্দি শহরে কারা আওয়াজ দিল 'আসামি ভাষা আমরা চাই'। সেদিন কাছাড়ের প্রবল পরাক্রমশালী নেতাও তো ছিলেন জেলা সদরে। উন্মত্ত জনতা শহরের কলেজ কলোনি, নূতন বাজার, লক্ষীশহর রোড, স্টেশন রোডে ঝাঁপিয়ে পড়ল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। 'আল্লা হো আকবর', 'আসামি ভাষা

আমাদের ভাষা', 'চালিহা সরকার জিন্দাবাদ', 'ময়ীনুল হক জিন্দাবাদ', 'হায়দর হোসেন জিন্দাবাদ' এমনকী 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'ও শোনা গেল। মন্ত্রী মহোদয়কে বিমানে উঠিয়ে ডেপুটি কমিশনার শ্রীবাস্তব সাহেব অকুস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি দেখে গুলি চালানোর নির্দেশ দিলেন। খবরে এল গুলি চালনায় নিহতদের সংখ্যা নাকি এগারো জনই।

রাস্তায় দাঁড়িয়েই প্রেমেন্দ্রবাবু আর সুসিত দত্ত এ কথাগুলো আলোচনা করছিলেন।

'একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন। উনিশে মে'র শহিদের সংখ্যার সঙ্গে উনিশ জুনের সংখ্যাটি কেমন অদ্ভুত ভাবে মিলে গেল'। প্রেমেন্দ্রবাবু বললেন, 'হাইলাকান্দির এই সংখ্যাটি কিন্তু প্রামাণিক কিছু নয়। সঠিক সংখ্যাটি আর পাওয়া যাবে না। পাওয়ার প্রয়োজনও নেই। আমি বলি, এই একাদশ আসলে একটি ম্যাজিক নাম্বার। এটা আমি অনেক দিন ভেবেছি। এ সংখ্যা নিয়ে সেদিন দেবব্রতবাবুও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এটা সংখ্যা নয়, একটি কাউন্টার থিসিস।' সুসিত দত্তর আক্ষেপ, মেহেরোত্রা কমিশনের রিপোর্ট বের হয় নি, 'এতগুলো প্রাণ গেল, কোন বিচার হল না। বাঙালির রক্তের কোন দাম নেই।'

'আমার আশঙ্কা হয় একদিন এই উনিশে মে নয়, উনিশ জুনের দাঙ্গাবাজদের শহিদের মর্যাদা দিয়ে বসেছে আমাদের গণতান্ত্রিক সরকার।'

এ ধরনের আলোচনা কোন স্থির লক্ষ্যে পৌঁছোয় না যদি না কোন তৃতীয় ব্যক্তির অংশগ্রহণ থাকে। এদের এই তাৎক্ষণিক সভা শেষ হয়ে গেলে বিদায় নেবার আগে প্রেমেন্দ্রবাবু মনে করিয়ে দিলেন রবিবারের প্রস্তাবিত বৈঠকের কথা। তাঁর স্কুলের একটি কক্ষে।

৩

সুসিতবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর প্রেমেন্দ্রবাবুর মনের মধ্যে অনেক বিষয় তোলপাড় করছে। রবিবারে সভায় কী কী আলোচনা হবে এটা স্থির করা যে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বার বার একই কথা। এত অন্যায়। বাংলাভাষা আর

বাঙালিদের প্রতি এত অবিচার। এত রক্তপাতের পরও নয় বছরের মাথায় বিশ্ববিদ্যালয় নতুন নির্দেশ জারি করল। শিক্ষার মাধ্যমে বাংলার কোন সংস্থান রাখতে চাইছে না। ওদের কাছে তা হলে ভাষা আইনের সংশোধনী, বাংলা ভাষার রক্ষাকবচ এসব ধর্তব্যের মধ্যেই আসছে না। একাদশ শহিদের পরও দ্বাদশ শহিদের রক্ত নিয়েও ওদের তৃষ্ণা মিটছে না।

স্বাধীনতার পর এদিকে আসা অবধি একটি দিনও স্বস্তিতে কাটানো হল না। জীবন জীবিকার কথা দূরে সরিয়ে বার বারই আন্দোলনের পথে হাঁটতে হচ্ছে তাঁকে। পুরো বাহাত্তর সালটাই গেছে পাগলের মতো দৌড়াদৌড়িতে। শিলচর, হাইলাকান্দি-করিমগঞ্জ ঘুরে ঘুরে শিক্ষক সংগঠন খাড়া করতে, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্কুলার প্রত্যাহার পর্যন্ত এক নাগাড়ে ছুটে চলা। এর বুঝি বিরাম নেই। ইতিমধ্যে নেতাজি বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে এগিয়ে গিয়ে যে একটার পর একটা মামলায় জড়িয়ে পড়তে হবে কে জানত? পাবলিক হাইস্কুলের সহকর্মীরা বলে, 'প্রেমেন্দ্রবাবু বাঘের তেল খেয়েছেন। আমরা একটা স্কুলের কাজ নিয়ে যেখানে হিমসিম খাচ্ছি, সেখানে তিনি আরেকটি ভেঞ্চার গার্লস স্কুলটির অবৈতনিক হেড মাস্টার'।

সবই কপাল। নইলে সবাই কেমন নিশ্চিন্তে চাকুরি করে সংসার করে যাচ্ছে। যাঁরা ওপার থেকে এসেছে এই সেদিন, ওঁরাই কেমন প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর দিকে কেমন করুণার দৃষ্টিতে তাকায়। দিন নেই রাত নেই, কেবল ছুটাছুটি। মাঝে মাঝে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেন, কী হত দেশবাড়িতে থেকে গেলে? সবাই কেমন একটা ঘোরের মধ্যে সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে চলে এল সীমানা পেরিয়ে। কেমন চমৎকার ছিল সেই সিলেটের রামসুন্দর হাইস্কুল, রসময় মেমোরিয়েল হাইস্কুলের শিক্ষকতার দিন! কেমন চমৎকার সেই ধর্মদা গ্রাম!

সত্যি কথা বলতে কি তাঁকে তো কেউ বলেনি এদেশ থেকে চলে যাও। কী যে আওয়াজ এল 'চল, পালাই, ওপারে যাই'। বাক্স পেটেরা, তল্পিতল্পা নিয়ে উন্মাদের মতো ছুট। বন্ধুরা, মানে মুসলমান বন্ধুরা কী বলছে, কী ভাবছে এসব কথা কেউই কানেও আনছে না। আপাতত পালিয়ে যেতেই হবে।

একটা সময় অনেকের মত তিনিও বিশ্বাস করেছিলেন এ দেশবিভাগ একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। তখনও যে রক্তে স্বাধীনতা আন্দোলনের উন্মাদনা রয়েছে। শুধু তাঁর মধ্যে নয়, মুসলিম বন্ধুরাও তাই ভাবত। যে সব স্কুলের ছাত্ররা সহপাঠীদের থেকে বিদায় নিয়ে হিন্দুস্তান চলে যাচ্ছে, ওঁরাও বিশ্বাস করত, এ ঝগড়া ক্ষণিকের কিছু দিন পরই এরা ফিরে আসবে। এদের ধারণা কিছুদিন কুটুমবাড়িতে থেকে বন্ধুরা আবার নিজের বাড়িতে ফিরে আসবেই আসবে। নিজের বাড়িতে তো ফিরে আসতেই হবে।

বড়োদের পাকিস্তান-পাকিস্তান উন্মাদনা খেলা দেখে যাঁরা স্কুলে হিন্দু-মুসলিমদের বসার বেঞ্চ আলাদা করে দিয়েছিল এরাও এখন হিন্দুশূন্য ক্লাসরুমে বসে বন্ধুদের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। যে স্যাররা এখনও স্কুলে আসছেন এদের মধ্যে কেমন একটা উদাস উদাস ভাব। পড়াতে পড়াতে হঠাৎ কেমন অমনোযোগী হয়ে যান। স্যাররা আজকাল আমাদের শাসনও করেন না। কী হল এদের? এরই মাঝে আচমকা দেখা যায় অঙ্কের স্যার আসছেন না। ক্লাসে কাণ্ঘুঁষা, স্যার আর আসবেন না। রাতের অন্ধকারে তাঁকে নাকি কারা দেখেছে জিনিসপত্র নিয়ে রেলস্টেশনে। তাহলে আমাদের কী হবে? সবে এলজেবরা শুরু হয়েছে। স্যার কী মজা করেই না আমাদের অঙ্ক শেখাতেন। আয়তক্ষেত্র আর বর্গক্ষেত্রের অঙ্ক কষাতে গিয়ে সেদিন ক্লাসের দেওয়ালের ইট গুণতে লাগিয়ে সেই কী ধুন্ধুমার কাণ্ড। কেউ বলছে তিন শো কেউ বলছে দেড় শো, কেউ বলছে আরও কোন একটা সংখ্যা। আমরা ক্লান্ত হলে পর স্যার হাসতে হাসতে বললেন, 'এই দ্যাখ, এত গুণাগুণির দরকারই নেই যদি অঙ্কটা ঠিকমত শিখে নাও। উপর দিকে আছে মোট ১৫টি ইট, আর প্রস্থে ৪০টি। পুরণ করে নাও, মোট সংখ্যা হল'— 'সবাই সমস্বরে বলল ৬০০।' আমরা চমকিত হলাম অঙ্কের এই মজা দেখে। গত সপ্তায় এলজেবরা শুরু করতে এসেই বললেন, 'আল জবর', মানে জবর। জবর মানে হল কঠিন। এই কঠিন কাজকে সহজ করতে হলে যে পদ্ধতি, তাই হল এলজেবরা। এখন থেকে অঙ্ক আর কঠিন পদ্ধতিতে করতে হবে না। ছাত্ররা উল্লসিত হয়ে উঠল। তাহলে আর অঙ্কের ভীতি থাকছে না। আঃ বেচে গেলাম। স্যার বললেন, 'সব মুশকিল আসান হল এই এলজেবরা। তোমরা যারা আরবি পড়ো, মৌলবি সাহেবকে জিজ্ঞেস করবে, এ শব্দটি আরবি না ফারসি?'

'এই স্যার যদি হিন্দুস্তান চলে যান, আমরা নির্ঘাত ফেল করব, 'এসব কথা কানে আসছে অহরহ। প্রেমেন্দ্রস্যার ওসব গ্রাহ্য করছেন না। কিন্তু চারি দিকে এত যাই যাই রব। কী করে স্রোতের বিরুদ্ধে যাই?

এখন ভাবেন, যদি মাটি কামড়ে পড়ে থাকতেন মাত্র পাঁচটা বছর? বাহান্নর ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত যদি দাঁত কামড়ে পড়ে থাকতেন?

পাকিস্তান সৃষ্টির উন্মাদনা কিঞ্চিত প্রশমিত হলেই জনসমক্ষে এল একটি প্রশ্ন, সেটা হল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে—উর্দু না বাংলা? দেশে থাকতেই প্রেমেন্দ্রমোহনের চোখে এসব রিপোর্ট পড়ছিল। তিনি বুঝছিলেন বাঙালির নব চেতনার কিছু স্বাক্ষর ফুটে উঠছে। পুরুষানুক্রমে বাঙ্গালা দেশের মধ্যে বাস করে, এই বাঙ্গালা ভাষাতেই সর্বক্ষণ মনের ভাব ব্যক্ত করেও যদি বাঙালি না হয়ে আমাদের অপর কোন একটা জাতি সেজে বেঁচে থাকতে হয়, এটা যে কী অভিশাপ তাই লিখেছেন জনৈকা নুরুন্নেসা বিদ্যাবিনোদ। এ লেখা পড়ে প্রেমেন্দ্রমোহন বুঝতে পারলেন বাঙালির চিন্তায় পরিবর্তন আসছে। কাজি মোতাহের হোসেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল মনসুর আহমেদ পূর্ব বঙ্গের বাঙালি মানসে একটা নতুন প্রশ্ন জাগিয়ে তুলছেন তা বেশ বোঝা যেতে লাগল।

প্রেমেন্দ্রমোহনের চোখে ভাসে সেই দৃশ্য, প্রকাশ্য সভায় এক দাড়িওয়ালা, মাথায় লম্বা টুপি, পরনে দীর্ঘ আলখাল্লা, বক্তৃতা করছেন সাহিত্য সম্মেলনে, 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় ছবিসহ বক্তব্যের বয়ান ছাপাও হয়েছে। ভয় চকিত বন্ধুরা বিস্মিত। কে ইনি-মৌলবি না মোল্লা? প্রেমেন্দ্রমোহন বললেন, 'ইনাকে মোল্লা বল, মৌলবি বল সবই ঠিক, সঙ্গে বলে পণ্ডিতমশাইও। তাঁর নাম মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।' শুনেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রীতিমত যুদ্ধ করে সংস্কৃত অনার্স পাঠক্রমে ভর্তি হয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছেন। বিদেশে ভাষাতত্ত্বের পাঠও নিয়ে এসেছেন। বন্ধুরা অবাক। সদ্য পাকিস্তান পেয়েছে ওঁরা, হিন্দুদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করার এত আয়োজন-- এরই মধ্যে এসব কথা, এটা কি সত্যি না আরও কোনও বিপদের ফাঁদ?

‘তোমরা শোনো, কী লিখছে কাগজে, আমি পড়ছি’ বলে প্রেমেন্দ্রমোহন হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। কী আশ্চর্য কথা বলছেন ইনি, নিজেই বিশ্বাস করতে পারছেন না,

> ‘আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙ্গালী। ...মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, ধূতি, লুঙ্গি মালা-তিলক টিকি দিয়ে তা ঢাকার জো নেই’।

তাহলে বুঝি সব শেষ হয়ে যায়নি। বাঙালি কি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে? একটি বছরও তো পেরোয় নি। এত এত লোকের সামনে এই কথা বলে গেলেন, কোন বিরুপ প্রতিক্রিয়া নেই। সত্যি, বাঙালি একটি আশ্চর্য জাতি। ধর্মের নামে এত রক্ত গঙ্গা বইয়ে এবার পরস্পর পরস্পরকে আপন করে নিতে চাইছে।

আসল পাকিস্তান প্রাপ্তির পর পরই বাঙালি মুসলিমের মোহমুক্তি শুরু হয়ে যায়। এ কী! দেশ পেলাম, কিন্তু জবান হারালাম। দেখ দেখি, মানিঅর্ডার ফর্ম, ডাকটিকিট, মুদ্রায় বাংলা লেই। কেবল ইংরেজি আর উর্দু! আমাদের ভাষা কোথায়? এ জন্য কি আমরা পাকিস্তান পেয়েছি? উর্দুর গোলামি করার জন্য? বাঙালির রক্ত গরম হয়ে উঠছে।

এরই মাঝে পাকিস্তান গণপরিষদে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন এক বিশাল বপুর অকুতভয় সদস্য। কই হিন্দু বলে তাঁর পেছন থেকে তো কেউ সরে যায়নি? ফেব্রুয়ারিতে গণপরিষদের অধিবেশনে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ‘পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে বাংলা চাই।’

শুরু হয়ে গেল ভাষাবিতর্ক। সিলেটে বসেই প্রেমেন্দ্রমোহন খবর পাচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্জন হলে রাষ্ট্রপতি জিন্নার সভায় ছাত্রদের উদ্ধত আচরণ। তিনি ভাষণ দিচ্ছেন, ‘একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’, তৎক্ষণাৎ তিনটি ছাত্র চিৎকার করে উঠেছে, ‘না, না, একমাত্র বাংলাই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।’

তা হলে হিন্দু-মুসলিমের ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক কি আবার গড়ে উঠতে চলছে? এ অবস্থায় হিন্দুরা দলে দলে ভারতে পাড়ি দিলে ধীরেনবাবুর মতো নেতারা যে একা হয়ে যাবেন। একা হয়ে যাবেন ওঁরাও যাঁরা ধর্মীয় রাষ্ট্রকে অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখিয়ে হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

প্রেমেন্দ্রমোহন বিষণ্ণ চিত্তে ভাবছেন, সেদিন যে আমরাও ওদের বিপণ্ণ করে একা ফেলে এসেছি, এ কথাটা কি একবারও ভেবেছি কেউ?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরও একবার জোরালো কণ্ঠে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উঠল। প্রেমেন্দ্রমোহন ভাবেন, কী হতে পারত যদি তাঁর মতো যুবকের দল মুসলিম ভাষাসেনানীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে পূর্ববাংলাকে গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করতেন? এখন যখন সীমান্তের ওপার থেকে ভেসে আসে সুর, 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' তিনি বিমর্ষ হয়ে যান। কই আমরা এপারে রক্তের বিনিময়ে পেলাম উনিশে মে, এ উনিশে উচ্চারণ আমাদের রক্তে সে রকম দোলা দেয় না কেন? আমরা কা'কে ভয় করি? ওঁরা তো পাঞ্জাবিদের মিলিটারি শাসনকে উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে ছেড়েছে। কিন্তু এদিকে আমাদের স্কুলে আসামের একটা স্বতন্ত্র জাতীয় সংগীত চালু করার আয়োজন। জাতীয় সংগীত কোনটা তাও কি আমাদের নতুন করে শিখতে হবে? আমরা কেবল ভয়ে মরি। এসব চিন্তা তাঁকে সর্বক্ষণ পীড়িত করে। কার সঙ্গে মন খুলে কথা বলবেন? তবে একটা বিশ্বাস তাঁর মনে ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলা সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে হতে পারে না। বাড়িঘর ছেড়ে এপাড়ে এসেই যে সমস্ত ক্রোধ উগরে দেবেন ওদের উপর এটা যুক্তিসঙ্গত নয়। দেশবিভাগের অজস্র কারণ রয়েছে। পূর্ববঙ্গে হিন্দু জমিদারের অত্যাচার, রক্ষণশীল হিন্দুদের আচরণ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিমদের পদানত করে রাখা-- এ সবকিছুর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মুসলিমদের তীব্র স্বাজাত্যবোধে। এত দুঃসহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েও আমরা এখনও মুসলিম কেন, অন্তজ হিন্দু কেউই ঘরের বারান্দায় উঠলে হাড়িপাতিল ফেলে দিই, কলসির জল অপবিত্র হয়ে গেছে ভেবে ফেলে দিই। আমরা তো সামাজিক মানুষ হবার শিক্ষা পাইনি। আমরা হয়ে উঠেছি হিন্দু কিংবা মুসলমান।

দীর্ঘদিন পর আরেক বিচিত্র স্ব ভাবের ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় এবং সখ্য হলে প্রেমেন্দ্রমোহন বুঝলেন বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখাও যায়। কট্টর বাম মতাদর্শী এ ব্যক্তি পাকিস্তান হয়ে গেলেও মুষড়ে না পড়ে দেশে বসেই নিজের রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকেন। এই শহরে তাঁকে নিয়ে অনেকে অনেক ধরনের কথাও বলেন। কেউ কেউ বলেন গুলি খাওয়া বাঘ। কোমর বাঁকা করে হাঁটেন। আসলে কমিউনিস্ট দলের হয়ে শ্রমিক-কৃষকের দাবি নিয়ে মুসলিম লিগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে বন্দি হয়ে চালান হয়েছিলেন রাজসাহী জেলার কেন্দ্রীয় কারাগারের খাপরা ওয়ার্ডে। পঞ্চাশ সালের এপ্রিল মাসের কোন একদিন ওই জেলের ভেতরই পাকিস্তান পুলিশ নির্মম ভাবে গুলি চালালে কয়েকজন নিহত হলেও আহত হয়ে তিনি বেঁচে গেছেন। কোমর বাঁকা অনন্ত দেবকে মানুষ না জেনে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে, তিনি কেবল হাসেন। সভা সমিতি, মিছিল সমাবেশে তো থাকেনই, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও তিনি জড়িত। তাঁকে নিয়েই প্রেমেন্দ্রবাবু কেন্দ্রীয় রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন, মাঠে সমবেত ভাবে কবি প্রণাম, নেতাজি জয়ন্তী পালনের প্রথাটি চালু করলেন। তিনি বলেন, 'আমি পালিয়ে টালিয়ে আসিনি। স্বাভাবিক পারিবারিক কারণেই আমি আজ বর্ডারের এপারে।'

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাও তাঁর হয়েছে। সিলেট নিয়ে খুব গর্বিত। শ্রীচৈতন্য-শাহজালালের দেশের মানুষের সাম্প্রদায়িকতা মানায় না, এটা তিনি বলেন। তাঁর আরও পরিচয় পাওয়া গেল বঙ্গসাহিত্যের এক অধিবেশনে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন এবং কবি আসাদ চৌধুরি এলে। সেলিনা হোসেনের উপন্যাস 'গায়ত্রী সন্ধ্যা'য় এই অনন্ত দেব যে স্বনামে উপস্থিত এটা জেনে সবাই পুলকিত হলেও অনন্তবাবুর তেমন কোন ভাবান্তর নেই। শহরের কেউ টেরও পায়নি কোনও এক সকালে বাংলাদেশ 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে'র কয়েকজন প্রতিনিধি তাঁর বাড়িতে এসে জানালো ওঁর কাছে খাপরা অত্যাচারের কোনও অভিজ্ঞান থাকলে ওরা সংরক্ষণের জন্য নিয়ে যেতে আগ্রহী। যে ক্জন ব্যক্তি সেদিন অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন ওঁদের আক্ষরিক অর্থেই ভড়কে দিয়ে অনন্ত দেব পুরনো তুরঙ্গ থেকে বের করে আনলেন পলিথিনে মোড়া রক্তমাখা একখানা কয়েদির ফতুয়া। আর দিলেন

সেই রক্তাক্ত দিনটির একটি প্রতিবেদন। পাছে ভুলে যান তাই সেদিনের অভিজ্ঞতাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন ওই রক্তাক্ত স্মারকের সঙ্গে। এ সূত্রে সবাই জানল অনন্তবাবুর সঙ্গী সংগ্রামী শহিদ কাম্পারণ সিং, বিজন সেন, সুধীন ধর, সুখেন ভট্টাচার্যের নাম। দেশটি ধর্মের ভিত্তিতে খণ্ডিত হলেও এরা মনোবল না হারিয়ে পাকিস্তানের মাটিতেই কমরেড মহম্মদ হানিফ, দিলোয়ার হোসেন, আনোয়ার হোসেনদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে লিগ সরকারের বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন।

এপারে এসেও অনন্ত দেব সেই শ্রমিক কৃষক আন্দোলন, লালঝান্ডা উড়িয়ে সম্প্রতি সমাজে অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক চেতনার প্রসারের জন্য অনেক ধরনের পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে আছেন। নাটক, গান, সাহিত্য, সমস্ত সাংস্কৃতিক কর্মে এ উদার মানবিক চেতনার প্রকাশ ঘটানো চাই, এটাই তাঁর বক্তব্য। প্রবল সমালোচনা বিদ্রুপের মধ্যেও 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' এ শ্লোগানকে আঁকড়ে ধরে আছেন। এদিকে যখনই অশান্তির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এ ব্যক্তিটি রাস্তায় নেমেছেন। পঞ্চায়েত, পৌরসভা কিম্বা বড় নির্বাচন উপলক্ষে শক্তিপ্রদর্শনে হিন্দু-মুসলিমরা শরীরচর্চায় লেগে গেলে ইনি ঠাণ্ডা করতে গিয়ে দালাল, (মুদ্রণের অযোগ্য)-দের পা'চাটা ইত্যাদি অভিধাও লাভ করেন। লোকটি বড় মুসলিমঘেঁষা, এসব বাক্যও তাঁর সম্বন্ধে উচ্চারিত হয়। তিনি যে বঙ্গসাহিত্যের সেক্রেটারি হিসেবে নিজের প্রিয়পাত্র এক ভিন্নধর্মী সাংবাদিকের পক্ষে দুই দুই বার জোর ব্যর্থ লড়াই দিয়েছেন।

বিতর্ক হয় বিভিন্ন সময়ে সাংগঠনিক চিঠিপত্রের বারনামার পাঠ নিয়ে। যেসব তরুণ যুবকদের সঙ্গে তাঁর চলাফেরা এদের সঙ্গেই বেঁধে যায় তর্কযুদ্ধ। ওঁরা কিছুতেই লিখবে না 'জনাব' অমুক, 'জনাব' তমুক। এমনকি প্রাপক একজন মুসলমান ধর্মাবলম্বী হলেও না। এসব নাকি এদের কলমে আসে না। তিনি বলেন, 'সম্মানিত অতিথিকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করতেই হয়। যাঁকে আমন্ত্রণ করছ, খবর নিয়ে দেখো ওঁরা এ ধরনের সম্ভাষণে স্বচ্ছন্দ।'

অনন্তবাবু বুঝতে পারছেন তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচুতে উঠতে পারে, তাই বলে নিলেন, 'আমি কথাটা একটু মোটা করে বলি, তোমরা ভাবো ধমক দিচ্ছি। শোনো, সামাজিক সংগঠন করছ, অথচ এই ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বসে আছ সমাজ

কেবলমাত্র একটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ। ব্যক্তিগত জীবন থেকে সময় বের করে, পড়াশোনার মধ্যেও একটু অবকাশ বের করে যখন সামাজিক জীবনে এসেই গেছ, তখন একটু সামাজিক হও। আর না হলে ঘরে ফিরে যাও, ক্যারিয়ার বানাও যেমন আর পাঁচজন করছে। কেউ তো আর ঘর থেকে টেনে আনছে না তোমাদের।'

"আপনি অন্যদিকে টার্ন নিচ্ছেন কাকু, আমরা বলছি, 'শ্রী', শ্রীযুক্ত' এরা কী দোষ করল কাকু? প্লিজ, অন্যদিকে যাবেন না।"

"এইখানেই তো তোমাদের সমস্যা, মুখে বড় বড় কথা, সেকুলারিজম, লিব্যারেলিজম। কিন্তু 'দাওয়াত' শব্দটা শুনলেই মনের ভেতর জাতিবিদ্বেষ চাঙ্গা দেয়। কেনরে বাপ, মুসলিমদের মুখে শুনো নাই নাকি কি সংস্কৃত তৎসম শব্দ? সেদিন মিঞাঁ সাহেবের মুখে 'সালাম' শব্দটি শুনে তোমরা জোরে জোরে হাসলে। এটা কি অশিষ্ট সম্ভাষণ ছিল? ঈদের কোরবানি নিয়ে কী সব কথা শুনে তোমরা বড়ো হচ্ছ। কালীবাড়ি, কাঁচাকান্তি বাড়ি আর কামাখ্যাবাড়িতে কি বলি দেখ না? ওই আমাদের মুখে বলি, ওঁদের মুখে কোরবানি। মনটাকে একটু উদার করা শিখো হে।"

সেই সন্ধ্যায় ঠিকানা লেখার পর্ব শেষ। শুরু হয়ে গেল বাক বিতন্ডা। অনন্তবাবু জানিয়ে দিলেন, কারো লেখার দরকার নেই, তিনি নিজেই লিখবেন, 'কিন্তু মনে রাখ হে বুদ্ধিজীবী, বাঙালি ঐক্যের কথা যখন বল তখন যদি ভাব মুসলিমরা তাঁদের নিজস্বতা ছেড়ে তোমাদের সঙ্গে মিশে যাবে, ভুল করবে।' সেয়ানা প্রতিদ্বন্দ্বী বলল, 'কাকু, আপনি এমন অদ্ভুত কথা বলছেন, এরপর আপনার সঙ্গে কে তর্ক করবে? যে ঢঙ দেখিয়েছিলেন একবার।'

'আমার বলার আর কিছু নাই বাপধনরা। আসলে তোমরা কিছু সংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে পারছ না, দোষ তোমাদের নয় অবশ্যই, দোষ আমাদের। আমরা পরিবেশটা অনেক আগেই নষ্ট করে রেখেছি। সেদিন এক বিজ্ঞ প্রফেসার নজরুলের উপর বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন-নজরুল ধর্মে মুসলমান হলেও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন-। এ কথার অর্থ যে কী, এটা মাস্টার হয়েও তিনি বুঝলেন না। তাঁর মানসিকতা এরকমই তৈরি হয়েছে। এর উর্ধ্ব উঠতে পারছেন না।

ভাগ্যিস নজরুল ইসলাম কিছু কীর্তন, শ্যামাসংগীত আর ভজন লিখে গেছেন, নইলে এই পণ্ডিতেরা তাঁকে সার্টিফিকেট দিতেন কি? দেখাও তো একজন হিন্দু কবি রচিত একখানি মারিফতি, মর্শিয়া বা ফকিরি পদ? জাস্ট আ সিঙ্গল পিস? সম্প্রীতি কি একতরফা হয়? এই সব প্রশ্ন নিজেই নিজেকে করো, উত্তর নিজেই পাবে।

অবশ্য মেলা কুতর্ক করলেও এই ছেলে ছোকড়াদের জন্য অনন্তবাবুর বড় টান। এই যে-প্রসঙ্গ নিয়ে আজ সন্ধ্যার সমস্ত কাজ মাটি হল, এর জন্য আগামীকাল বিস্তর পস্তাতে হবে, তবুও তিনি খুশি। তিনি বলেন, সাংস্কৃতিক সংগঠন তো শুধু নাচ গানের উৎসব নয়, মনোজগতের সম্প্রসারণও বটে। বেয়াড়া তর্ক থেকেই তো একটা সত্য বেরোবে। এ না করলে মনের ভেতর জমে ওঠা হিংসা, অসহিষ্ণুতা এই জাতিকে কোন দিকে নিয়ে যাবে কে জানে।

৪

দেশ বিভাগ যে এ উপমহাদেশে কত কাণ্ড ঘটিয়েছে! কেউ কেউ দেশ বিভাগের কয়েক দশক আগেই এদিকে এসে বসতি করেছিলেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোনও কারণ ছাড়াই নিজেদের বাস্তুহারা, রিফিউজি বলে পরিচয় দিচ্ছেন। প্রেমেনবাবু জানেন এর পেছনে কী কারণ থাকতে পারে। তবে এদিকে মনোযোগ দিলে হাতে যে কাজ রয়েছে এদিকে লক্ষভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা। এদিকে স্থানীয় জমিদার যতিবাবু আবার এই শরনার্থী, রেফিউজি শব্দগুলো পরিহার করার পক্ষে মতামত দিচ্ছেন। কথাটা প্রেমেনবাবুর খুব মনে ধরেছে। হিংসার অনুশীলন ছাড়া যাদের বিশেষ কিছু করার নেই, এরাই সদর্পে চেঁচিয়ে বলছেন ওঁরা উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান। যেন এসব বললে সরকার তাঁদের জন্য দানসত্র খুলে বসবে। দেবব্রতবাবু এসব শুনে বলেন, 'সে অর্থে তো আমরা সবাইই উদ্বাস্তু। খাইবার পাস গিরিবর্ত্ম দিয়ে যে-আর্যরা এ দেশে প্রবেশ করেছে এরাও তাই। আর পাতকৈ পর্বত পেরিয়ে যারা আসামে এল এদের অবশ্য এরকম অভিধা দিলে বিপদ হতে পারে, তবে এরাও আগন্তুক তো বটে। সেই অর্থে শ্রীমঙ্গল বৃন্দাবন কলেজ থেকে গুরুচরণ কলেজে চলে আসা আমাকেও আপনারা উদ্বাস্তু বলবেন' বলে স্বভাবসুলভ হাসি দিলেন অধ্যাপক দত্ত।

'আসল কথা হল ব্রিটিশ আমলের প্রথম পর্যায়ে কাছাড় ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ঢাকা ডিভিশনের আওতায়। সেই সূত্রে ঢাকা ময়মনসিং থেকে বক্সি, নাহা, রায়, পাল, ভুঁইঞা, ঘোষ, বোস, গুহ, মিত্ররা কাছাড়ে এসেছে। সরকারি দফতরেও উর্দ্ধতন আমলা, নকল নবিশ, নকশানবিশ, ইংলিশ রাইটার ছাড়াও উকিল, মোক্তাররাও শিলচর শহরে এসে বসতি করেছেন, বাড়িঘর করেছেন, দোকান মেলেছেন, কাছাড়ের অসংখ্য চা বাগানে চাকরি নিয়েছেন। এদেরকে নিয়ে উদ্বাস্তুর সংখ্যা বাড়িয়ে দেখানো ঠিক নয়। এতে ভবিষ্যতে সমস্যা আসতে পারে। আজ নয় অদূর ভবিষ্যতেই।'

প্রেমেন্দ্রবাবুর চিন্তা বহুগামী। কোথা থেকে কোথায় যায় নিজেই বুঝেন না। ভাবছিলেন নিজ জন্মভূমির কথা। কেমন সুন্দর ছিল দিনগুলো। পরিবর্তনের আভাস তো তিনি নিজেই দেখে এসেছেন। কিন্তু এর মাঝে যে ভৈরবি কাণ্ড হয়ে গেল। যদি তাঁরও এরকম কোন ঘটনার মুখমুখি হতে হত, তখন এপারে এসে সম্প্রীতির কথা বলা যে চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যেত।

মাঝে মাঝে নিজের উপর অভিমান হয়। অভিমান হয় যখন দেখেন এপারে এসে সেই বাঙালির চেতনা হয়নি। যে রাজ্যে নতুন করে বসতি করেছে এটা যে ভারতবর্ষ, তাঁদের আদি অনাদি মাতৃভূমি, এখানে নিজের অধিকার চাওয়া কোন কৃপা প্রার্থনা নয়-- এ কথাটা ওদেরই বুঝাতে পারলাম না যাদের জন্য ফাইল বগলে রিলিফ অফিস আর ডেপুটি কমিশনারের অফিসে ছুটাছুটি করেছি। সামান্য প্রলোভনে এরা সমঝতা করে নিতে পারেন। নিজের জন্য আমার কিছু চাওয়ার নেই। আমি সব ধরনের কাজ করতে পারি, প্রয়োজনে পেটে গামছা বেঁধেও থাকতে পারি। কিন্তু সেই হতভাগা, অপরিণামদর্শী রিফিউজির দল। মূলত এদের দাবি দাওয়া, অভাব অনটন এসব বিষয় জনসমক্ষে তুলে ধরা, সরকারের দৃষ্টিগোচর করা, এ উদ্দেশ্যে শুরু করলেন সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা The Chronicle। পূর্বপাকিস্তান থেকে বাস্তুচ্যুতদের এ দেশে আগমন, কাছাড়ে এদের পুনর্বাসন ছাড়াও রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থা, কাছাড়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খবরাখবর এবং এ সংক্রান্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধ নিয়ে পত্রিকাটি সামাজিক জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু আক্ষেপ, ইতিমধ্যে যারা এপারে এসে নিজেদের মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন, এরা এসব দিকে একেবারেই

উদাসীন। এ অবস্থায় সাধারণ ভুক্তভোগীদের ভাগ্যের হাতে নিজেদের সমর্পন করা ছাড়া আর কী ই বা করার থাকতে পারে? আর আরেকটি শ্রেণী তৈরী হয়েছে, যারা ভেবেছে সবকিছু অমনি অমনি হাতে এসে যাবে। সরকার তো সব দেবেই। এদের অবস্থা দেখে প্রেমেন্দ্রবাবু হাসবেন না কাঁদবেন বুঝতে পারেন না। এরা যদি ভাবে সরকার তাঁদের বসে বসে খাবার ব্যবস্থা করে দেবে তবে এরা মুর্খের স্বর্গে বাস করছে। জমিদারি যখন ছেড়ে এসেছ বাবারা তখন জমিদারি মেজাজটা পরিত্যাগ করে কাজে নামো, দেখবে--।

হায়! হায়! আজকাল নিজেই নিজেকে ভাষণ দিচ্ছি। সম্বিত ফিরে পেলেন প্রেমেন্দ্রবাবু। পশ্চিম সীমান্তে পাঞ্জাবিরা কিন্তু ধাক্কা সামলে নিয়েছে। কেন? না ওঁরা কেউ ওপারে জমিদার, রাজা মহারাজা ছিল না। ওঁরা মাঠে নেমে গেছে, কারখানার কাজে লেগে গেছে। রাজধানীর ফুটপাতে শুয়ে জীবনসংগ্রামে নেমেছে। ত্রিশ বছরে জীবন ফিরিয়ে নিয়েছে। আমারা তো বিলাপ, আক্ষেপ আর বাগাড়ম্বর করে দিন কাটাচ্ছি। এই শহরের বুকেই দেখলাম, আমাকে দেখলে রাস্তা পালটে অন্য দিকে হাঁটা দেয় কারা। আমি বলি, আমাকে পোষায় না এসো না, কাছাড়ে আরও একজন ব্যক্তিও আছেন, তিনিও তোমাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, তারাপদ ভট্টাচার্য, তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াও। না, সামান্য একটা কেরানি বা ইশকুল মাস্টারের চাকুরি পেয়েই ব্যক্তিগত সুখের দালান গড়তে ব্যস্ত এরা। অবশ্য আমার মুখে সব কথা বোধহয় শোভা পায় না। কিন্তু বড়খলার জমিদার যতিবাবু উদ্বাস্তুদের প্রতি গভীর মমত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'কী অভিপ্রায়ে সরকার শিবির স্থাপন করে হাজার হাজার অসহায় নরনারী, শিশুকে বছরের পর বছর বসাইয়া ও বিনা পরিশ্রমে আহার যোগাইয়া ক্লীবে পরিণত করিতেছেন?' তিনি এসব বলতে পারেন। তাঁর বলার হক আছে। নিজের জমিতে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েছেন, নিজের বাড়িতে অভুক্তকে অন্ন জুগিয়েছেন, এদের সুখদুঃখের সমব্যথী হয়েছেন, এমনকী স্থানীয় জমিদার মিরাশদারদের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে 'উদ্বাস্তু সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির' সভাপতির দায়িত্বও নিজের মাথায় নিয়েছেন।

মনে আছে সেদিনের কথা, 'উদ্বাস্তু সম্মেলনে' সভাপতির ভাষণে তিনি বলছিলেন, কাছাড় জেলায় চাষ-বাস যোগ্য অনাবাদি ভূমির অপ্রতুলতা নাই।

উদ্বাস্তুদের মধ্যে উন্নত ধরনের কৃষি বিদ্যাবিশারদ কৃষক ও মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তিও আছেন... কাছাড়বাসীর সঙ্গে একীভূত হয়ে কাছাড়ের নাগরিক হিসেবে বসবাসের সুযোগ থেকে এরা বঞ্চিত। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, কী কারণে ঘুঙ্গুর, পাঁচগ্রাম, রামকৃষ্ণনগর কলোনিতে কারিগিরি শিক্ষার ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হল? তাঁর শেষ কথাটি মনে রাখার মতোই বটে, 'এই উদ্বাস্তু পরিবারগুলি যাতে সত্বর উদ্বাস্তু সংজ্ঞা মুক্ত হয়ে কাছাড় জেলার অধিবাসী পর্যায়ভুক্ত হয়' ইত্যাদি। এই উদ্বাস্তু সংজ্ঞা মুক্ত হওয়ার সাধনাটা কী হতে পারে এ নিয়ে প্রেমেন্দ্রবাবু খুব চিন্তা করছেন। অসহায়ের মত সরকারের কৃপাপ্রার্থী না হয়ে নিজেদেরই কাজে লাগা প্রয়োজন। যে কোন ধরনের কাজ।

সেই সব দিনও গেছে। এবার মন দিয়ে শিক্ষকতা করবেন সেটিও হবার জো নেই। ধর্মদা গ্রামের সেই রোগা মানুষটির মাথার উপর যে একের পর এক বোঝাই আসে। তিনি কি নিজে যেচে নেন, না এ সব তাঁর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার অবকাশ কোথায়?

বাঙালিদের মধ্যে এত নির্লিপ্তি দেখে তিনি মাঝে মাঝে খেপে যান। অন্যকে দোষ দেওয়ার আগে কিছুটা আত্মসমালোচনারও প্রয়োজন। জোড়হাটে স্বভাষীদের নির্লিপ্তি দেখে মনে হল এরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসেছেন দুই দিনের ফুর্তি করার জন্য। সাহিত্য একটা উপলক্ষ মাত্র। সারা ভারতে যে বাঙালি আর বাংলা ভাষা দিনে দিনে কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে এ নিয়ে কারও কোন ভাবনাচিন্তা নেই। এরা আকাশ থেকে পড়েন যখন বলা হয় এই মাত্র পনেরো বছর হল বাংলাভাষার অধিকার চেয়ে শিলচরে এত রক্ত দিল বাঙালি। ওঁরা ভুল করেন, ভাবেন আমি বাহান্নর কথা বলছি, রফিক জব্বারের কথা বলছি। ঢাকার ওই মহান একুশের আত্মবলিদানের সঙ্গে শিলচরেরও একটা আত্মবলিদানের ব্যাপার রয়েছে এটা বোঝার মত মানসিকতাও নেই প্রবাসী বাঙালির। একজন বললেন, 'ও বুঝতে পারছি আপনি বাংলাদেশের কথা বলছেন?' খামোখা আর ওদের ভূগোল বোঝানোর চেষ্টা না করে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে হল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্কু মহারাজ, সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর মতো দিকপালরা যে-সাহিত্য অধিবেশনের মঞ্চ আলো করে রয়েছেন সেখানে আসামেরই একটি জেলায় বাঙালি ও বাংলাভাষা নিয়ে কোন বিশেষ চর্চার সুযোগই হল না। এগারো

জন ভাষাশহিদের কথা একটিবার মাত্র উচ্চারিতই হল না। সারা বিশ্ব যে বছর বিপুল আড়ম্বরে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদযাপন করেছিল সেই বছর রবীন্দ্রসম্পর্কধন্য এই আসাম রাজ্যে শিলচর শহরে কবিগুরুর ভাষার অধিকার চেয়ে এতজন বাঙালি প্রাণ দিল, এটা বাঙালির কাছে কোন ঘটনাই নয় মনে হল।

প্রেমেনবাবুর মনের মধ্যে ওই সব কথা নতুন করে জেগে উঠল। এত অন্যায়, বাংলা ভাষা আর বাঙালি জাতির প্রতি এত অবিচার, এত অত্যাচার রক্তপাতের পরও আবার বাংলা ভাষাকে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে হটিয়ে দেবার নতুন চক্রান্ত। এবার মাঠে নামলেন গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তিনের দশক থেকে আসাম ভ্যালি আর সুরমা ভ্যালির মধ্যে যে টালাবাহানা চলছিল এর সমাধান কল্পে যে ব্যক্তির অবদান মুখ্য তিনি আর কেউ নন, শিলচরের অরুণকুমার চন্দ। তিনিই সুরমা উপত্যকার বিধায়কদের ঐক্যমতে এনে এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজে গতি এনেছেন। মূলত তাঁর একটি ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থান নির্দ্ধারণে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে গৌহাটি নগরীকে এক বাক্যে সবাই গ্রহণ করেছেন। পঁয়তাল্লিশ সালে আসাম বিধান পরিষদে তিনি যে কথাগুলো বলে সমস্ত বিরোধীদের স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন এ জন্য সেদিন সাংসদ যোগেন্দ্রনাথ গোঁহাই চন্দমশাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। অমিয়কুমার দাশও তাঁর আত্মজীবনীতে এ বাঙালি নেতার অবদান স্বীকার করেছেন। কিন্তু আজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসবকে ধর্তব্যের মধ্যেই না এনে বিকল্পহীন ভাবে কলেজগুলোর শিক্ষার মাধ্যম অসমিয়া বলে ঘোষণা করে বসলেন। আসাম রাজ্যভাষা আইনে একষট্টির সংশোধনীটি বেমালুম অস্বীকার করে জারি করে দিলেন একটি নির্দেশনামা। বরাকের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শহিদের সংখ্যাবৃদ্ধিও হল, দ্বাদশ শহিদ। সেদিনও প্রেমেনবাবুকে রাস্তায় নামতে হয়েছে। রাস্তায় নামতে হয়েছে কাছাড়ের ইশকুল মাস্টারদের। মূলত তাঁদের প্রবল প্রতিরোধে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের নির্দেশটিকে আপাতত স্থগিত রাখলেন।

প্রেমেন্দ্রবাবু সেদিন সেদিন রেল গাড়ির কামরায় বসে বলেছিলেন, ‘আমাদের চাই একটা নিজস্ব সংগঠন। এটা কোন উগ্র ভাষাপ্রেম নয়, উদারনৈতিক একটি সংগঠন যেখানে বাঙালি ছাড়াও প্রতিবেশি বিভিন্ন ভাষিকগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে।’

৫

সন্ধ্যাবেলা প্রেমেনবাবু দ্রুতগতিতে হেঁটে যাচ্ছিলেন সেন্ট্যাল রোড দিয়ে। আজ একটু তাড়া আছে। বাড়িতে চলে যেতে হবে। অথচ ওদিকে ন্যায়পঞ্চানন বাড়ির আসরে সবাই যে তাঁরই প্রতীক্ষায়। দেবব্রতবাবু, সুসিতকুমার দত্ত, সুখরঞ্জন চন্দ, মহিতোষ পুরকায়স্থ, জ্যোতির্ময় সেন, আর কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য তো আছেনই। সেই জোড়হাট থেকে এসে অবধি সময়ই করতে পারছেন না এখানে আসতে। কালীজয় ন্যায়পঞ্চানন স্থাপিত এই 'আয়ুর্বেদ আশ্রমে'র ঘরটিতে শহরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ্যদের এই সান্ধ্য আসরের সদস্যরা আজ প্রেমেন্দ্রবাবুকে দ্রুতপায়ে তাঁদের এড়িয়ে যেতে দেখে সমস্বরে বলে উঠলেন, 'প্রেমেন্দ্রবাবু! প্রেমেন্দ্রবাবু! আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।' রাস্তা থেকেই জিজ্ঞেস কলেন, 'কী ব্যাপার?'

'আমরা ভাবছি একটা সাহিত্য সম্মেলন করব।'

সাহিত্য সম্মেলনের প্রস্তাব শুনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'ভাল কথা, করুন। সম্মেলন তো আরও হয়েছে। দুই দিনের আনন্দ উৎসব— তার পর তো সবাই যার নিজের ঘরে।'

এতটুকু কথা বলার পর তো আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। ওদের কথা না শোনাটা অসভ্যতা হবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি দুই সিঁড়ি উঠে গিয়ে তাঁর জন্য খালি করা কাঠের চেয়ারটিতে বসলেন। তাঁর কথা শোনার জন্য সবাই আগ্রহী-। তিনি বললেন, 'যদি স্থায়ী সংগঠন করা না যায় তা হলে এ ভাবে উৎসব করে লাভ কি?'

ওদিক থেকে সমস্বরে আওয়াজ, 'আরে, আমরা একটা স্থায়ী সংগঠন করার কথাই ভাবছি'।

আজ আর প্রেমেন্দ্রবাবুর তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়া হল না।

৬

কাছাড়ের সচেতন মানসে একষট্টির অভিঘাত খুব সূক্ষ্মভাবে একটা আত্মানুসন্ধানের অনুপ্রেরণা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ ভূমিতে বাঙালিদের

বৈধতা নিয়ে যে একটা সন্দেহের বীজ খুব সুচতুর ভাবে ছড়ানো হয়েছে এটা অনেকেই বুঝছেন। গোয়ালপাড়ার অভিজাত রায়চৌধুরী বংশজাত পণ্ডিত, সামাজিক নেতা অম্বিকাগিরিবাবুর স্বাক্ষরিত একটি আবেদন ইদানীং এখানে ওখানে ঘুরছে। স্বস্তা নিউজ প্রিন্টে ছাপানো এ বাংলা লিফলেট দেখে দেবব্রতবাবু রসিকতা করে বলেন, 'এ হালকা কাগজটি দেখুন ঘুরে ফিরে বার বারই হাতে আসে। এই দেখুন না, কাগজটি। বলে দেবব্রতবাবু সামনে মেলে ধরলেন "বর্ণ শ্রেণী নির্বিশেষে কাছারর খিলঞ্জীয়া ভাই ভনী সকললৈ 'অসম জাতীয় মহাসভার নিবেদন-আহ্বান।'' তিনি চশমাটি পরে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন— "কাছাড় ভারতর অবিচ্ছেদ্য অসম রাজ্যর বিশিষ্ট অঙ্গ। কাছারত দেব, নাথ মিতাই, লস্কর, বরলস্কর, ভুঞা, বারভুঞা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মণিপুরী, হিড়িম্বা কাছারী, রাজবংশী, রাজখোয়া, চৌধুরী, দাস, পাটনি, দত্ত, চক্রবর্তী আদি খিতাবধারী আপোনালোকে অসম-মাতৃর খিলঞ্জীয়া সন্তান অসমিয়া। আপনালোকর ভাষিক সাংস্কৃতিক পরিচয় অসমীয়া। কিন্তু শোধনধর্মী সাম্রাজ্যবাদিক বাহিরর পরা পমুয়া ভগনীয়া কিছুমানে উক্ত সকলোবিলাক ক্ষেত্রর পরা আপোনালোকর ভগবৎদত্ত পৈত্রিক অধিকার উচ্ছেদ করি কাছাড়ত আপোনালোকক চির পদানত করি রাখিবলৈকে নানা ফন্দি অবলম্বন করিছে।'' এটুকু পড়ে দেবব্রতবাবু একটু থামলেন, 'কয়েকটি শব্দের জন্য হেমকোষ দেখতেই হবে, তবে কথার মূল আবেদন উপলব্ধি করতে অসুবিধা নেই' বলে আবার পাঠ শুরু করলেন— "আপনালোকে ---পমুয়া ভগনীয়া হকলর এই অভিসন্ধিক কাছাড়ত সাফল্য লাভ করিবলৈ দিবনে? নিশ্চয় নিদিব। দিলে কাছাড়র খিলঞ্জীয়া লোক হকলর মৃত্যু ঘটিব।'' এটুকু পড়ে ক্লান্ত দেবব্রতবাবু বললেন, 'থাক আর পড়ে কাজ নেই। আমি শুধু আশ্চর্য হচ্ছি, এই পণ্ডিত ব্যাক্তির মনের ভেতর এত বিষ জমা হল কী করে? সেদিন বড়খলার যতিবাবুর সঙ্গে অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী প্রসঙ্গে কথা হল। তিনি তাঁর গৌহাটির উজানবাজারের বাড়িতে গিয়েছিলেন স্টেট রি-অর্গানাইজেশন কমিশনের কাছে ওদের আসন্ন আবেদন বিষয়ে কিছু কথা বলতে। অতিশয় ভদ্র বিনয়ী লোকটি নাকি চরম একরোখা। বাঙালিদের প্রতি ওঁর একটা বীতরাগ রয়েছেই।' শ্রোতারা শেষ কয়েকটি পঙক্তি শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি আবার পড়া শুরু করলেন, "অলপতে রাজ্য পুনর্গঠন আয়োগ অসমলৈ আহিব। আপনালোক কাছাড়র সমগ্র খিলঞ্জীয়া লোক সংঘই অসম জাতীয় মহাসভার আদর্শত খুব

শান্তিপূর্ণ শৃঙ্খলিত সুদৃঢ় ভাবে সংগঠিত হোই একমুখে রাজ্য পুনর্গঠন আয়োগক কৈ দিয়ক—আমি ভাষিক সাংস্কৃতিক বিষয়ত অসম মাতৃর খিলঞ্জীয়া সন্তান অসমীয়া— কাছাড়ত পমুয়া-ভগনীয়ার ভাষিক -সাংস্কৃতিক ভিত্তি স্থাপন করি অসম মাতৃক খণ্ড-বিখণ্ড করিব কোনো অধিকার নাই। এইখিনি নকরিলে কাছাড়ত খিলঞ্জীয়া অসমীয়ার অস্তিত্ব রক্ষা করিবর আন একো পথ নাই। শ্রী অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী, জেনারেল সেক্রেটারি, আসম জাতীয় মহাসভা। তারিখ গুয়াহাটী ২০/৩/৫৫। কী বিভাজনের দলিল! এখানে কাছাড়ের ভূমিপুত্র আদি বাসিন্দার একটি তালিকা দিয়ে বেশ সুন্দরভাবে এদের আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে। এরাই নাকি একমাত্র বৈধ নাগরিক, আসামের নাগরিক। বাকিরা সব আগন্তুক, কারণ এরা আসামের রাজ্যভাষা স্বীকার করছে না। দেখুন না-- দেব, পাটনি, নমশূদ্র, বড়ভুঁইয়া, লস্কর, মজুমদার, হ্যাঁ-- চক্রবর্তী, চৌধুরীও আছেন কয়েকজন। এদের সরাসরি এড্রেস করা হচ্ছে এখানে। এরা বুঝি মাতৃভাষা ছেড়ে বিজাতীয় ভাষা গ্রহণ করতে চাইছেন? কী মুশকিল! জীবনধারা, চেহারা ছবি পালটানো যায়। ইচ্ছে করলে ধর্মও পাল্টানো যায়, যেমন মাইকেল করেছেন। কিন্তু ভাষা কী করে পাল্টাবেন এরা?

পিছন থেকে সংযোজন করলেন সদ্য চাকুরিতে জয়েন করা মাস্টার মশাই, 'ঠিকই তো স্যার। এই যে শিলচরের চন্দ পরিবার এরা তো হিল্লি দিল্লি লন্ডন ফ্রান্স ঘুরেও মাতৃভাষা, এমনকী আঞ্চলিক ভাষার টানই পাল্টাতে পারলেন না, একেবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের একজন হয়ে বসবাস করেও।

'কার কথা বলছো?'

'আজ্ঞে অনিল চন্দ। শুনেছি একবার কবিগুরুর একটি নাটক মঞ্চায়নের দিনেই একজন কুশিলব অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রস্তাব এল, অনিলবাবুকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া হোক। কিন্তু কবি তা পত্রপাঠ নাকচ করে দিলেন, 'না, না। অনিলকে দিয়ে হবে না। ওঁ যে বই উচ্চারণ করতে পারে না। বলে ভ-ই-ই।'

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের অনুগামী অধ্যাপক দেবব্রত দত্ত ইতিহাসকে শুধু জনমুখী করে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি, উপলব্ধি কললেন মাতৃভাষায় ইতিহাস চর্চার প্রয়োজনীয়তাও। অনুভব করলেন ইতিহাসবিস্মৃত

জাতিই প্রধাণত বিভ্রান্তির শিকার হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী দিনগুলোতে যে প্রণালীবদ্ধ ভাবে অবহেলা এবং আক্রমণের শিকার হচ্ছে সুরমা কাছাড়ের বাসিন্দা, রুখে দাঁড়াতে হলে এদের প্রধান অবলম্বনই তো ইতিহাস। দেশভাগের বলি বাস্তুহারা হাজার হাজার মানুষ যে আদি অনাদি ভারতবর্ষেরই একটি অঞ্চল থেকে এসেছে। অন্য কোন দেশ থেকে তো নয়। সিলেট-কাছাড় নিয়ে যে অখণ্ড ভৌগোলিক নৃতাত্ত্বিক একটি ইউনিট—এ সত্যটি অস্বীকার করে ভারতের অখণ্ডতায় আস্থাশীল মানুষই তো এদিকে এসে ঘর বেঁধেছে। এদের অস্বীকার করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে ইতিহাসই সবচেয়ে বড় আয়ূধ।

কলকাতা বিশ্ববিদালয়ের মাস্টারমশাইয়ের উপদেশ মতো দেবব্রতবাবু ঢুকে গেলেন সরকারি মহাফেজখানার ভেতর। ডুবে গেলেন ইংরেজ অধিগ্রহণ পর্বের দলিল দস্তাবেজ, নথির পাহাড়ে। গত শতকের কোম্পানির কাগজপত্রের জঙ্গলে আবিষ্কার করলেন জেলা প্রশাসকের পত্রাকারে প্রেরিত শতাধিক প্রতিবেদন। ক্যাপ্টেন টমাশ ফিশার থেকে রবার্ট স্টেওয়ার্ট পর্যন্ত প্রশাসনিক নথি নিয়ে বের করলেন 'কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডস'। বইটি প্রকাশ করলেন গজেন্দ্র দত্ত তাঁর 'জয়ন্তী প্রেস' থেকে।

কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ, পরণে সূতির পাজামা, শার্ট। দেবব্রতবাবুর ছাত্র জয়ন্তভূষণ নেমেছেন ইতিহাস অনুসন্ধানে। হাতে স্যারের 'কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডস'। জয়ন্তভূষণ বুঝতে পারছেন, এ রেকর্ডরুমে শতবর্ষ প্রাচীন নথি পাঠোদ্ধার করতে করতেই স্যারের চোখদুটো দুর্বল হয়েছে। আর বদ্ধঘরের সেই গ্যামাকসিনের গন্ধও তাঁকে নানা ভাবে ঘায়েল করেছে। গ্রামকাছাড়ের এখানে ওখানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, আর্কাইভ, শিলং এসেম্বলি লাইব্রেরি, দিল্লির নেহেরু মিউজিয়াম, সরকারি মহাফেজখানা সর্বত্র ঘুরে চলেছে কাছাড়ের ধোয়ারবন্দের এ মেধাবী সন্তান। বাড়ি থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে একটি এমই স্কুলে একা একা পায়ে আসা যাওয়া করতে করতেই জিসি কলেজ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন। ইতিহাসে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেও তাঁর জ্ঞানতৃষা মেটেনি। নিজেই আশ্চর্য হয়ে যান সেই দিনগুলোর কথা ভাবলে—বনের পথে বাড়ি ফেরার সময় বাঘের ডাক শুনে দাঁত কপাটি লাগার ঘটনা। তখন ধোয়ারবন্দ নাকি বাঘের রাজধানী ছিল। ইতিমধ্যে মেঘালয়ের একটি কলেজে

চাকরি পেয়ে ঐতিহাসিক হেড়ম্বকান্ত বড়পূজারির তত্ত্বাবধানে একটি গবেষণা কর্মেও নেমেছেন জয়ন্তভূষণ। রাজ্যসভার সদস্য হয়ে মহীতোষ পুরকায়স্থ দিল্লিতে গেলে তাঁর সাহায্যে জয়ন্তভুষণের সরকারি নথিপত্র ঘাঁটাঘাটিতে খুব সুবিধাও হল। আশা করা যায় বছর দু একের মধ্যেই ঔপনিবেশিক আমলে কাছাড়ের উপর তথ্যপূর্ণ প্রামাণ্য গ্রন্থটি হয়ে যাবে।

ওদিকে উদীয়মান সাংবাদিক অমিতকুমার নাগ কলেজে পড়াকালীনই একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা শুরু করলেন। গবেষণাধর্মী তবে খুব সহজবোধ্য ভাষায় সুখপাঠ্য এ পত্রিকায় কাছাড়ের সমাজ, অর্থনীতি, ভাষা ইতিহাস, রাজনীতি নিয়ে বিদ্বৎজনেরা লিখছেন। কাছাড়ি রাজসভা, লক্ষ্মীপুরের আনারস, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন শিলচর, জনজাতি—নানা বিষয় নিয়ে মূল্যবান আলোচনা শুধু পত্রিকার নয় পুরো অঞ্চলেরই বৌদ্ধিক মান বাড়িয়ে তুলল। ইতিমধ্যে অবশ্য আরেকটি পত্রিকা 'হৈড়ম্ব' আসর জমিয়ে দিয়েছে। দেবব্রতবাবু এতে আঞ্চলিক ভাষা, উপভাষা বিষয়ক একটি আলোচনায় খোদ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টপাধ্যায়কে জড়িয়ে ফেললেন। কাছাড়ের ঔপভাষিক চরিত্রলক্ষণ নিয়ে একটি গভীর চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে অসমিয়া ভাষাতাত্ত্বিক রায় বাহাদুর বেণুধর রাজখোয়ার একটি ইংরেজি চটি বই, Notes on the Sylhetee Dialect আবার নতুন করে প্রচারের আলোয় এল। কাছাড়ের বাঙালির ভাষিক চরিত্রকে অস্বীকার না করলে যে রাজ্যটিকে একভাষী রাজ্যে পরিণত করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে আবার না বুঝে সায় দেবার মানুষের অভাবও নেই এই ভাষাশহিদের মাটিতে। ১৯১৪ সালে রাজখোয়া মহোদয়ের চটি বই প্রকাশের দুই বৎসর পর সুরমা সাহিত্য সম্মেলনীর তৃতীয় অধিবেশনে ভুবনমোহন দেবশর্ম্মাবিদ্যার্ণব মহোদয় তাঁর অভিভাষণে বলেন, 'দুঃখের বিষয়, আমাদের ভাষা ও সাহিত্য লইয়া কিছুদিন পূর্বে একটা সন্দেহবাত্যা বহিয়া গিয়াছে। কোন কোন পাশ্চাত্য লেখকের লেখনীমুখে প্রকাশিত হইয়াছিল শ্রীহট্টের বাগ্ব্যবহার বঙ্গভাষা হইতে স্বতন্ত্র'। ... 'আমাদের সাহিত্যের ভাষা বাঙ্গালা। উহার ঢাকাই-রঙ্গপুরী, শ্রীহট্টি-যশোরী সংস্করণ নাই। বঙ্গভাষা উপাসনায় আমাদের নিম্নলিখিত পাশ্চাত্য মন্ত্রটি স্মরণ রাখিতে হইবে–There is neither Greek, nor Jew, but Christ is all।' তিনি বলতে চেয়েছেন, বাংলা ভাষার 'শ্রীহট্ট নদীয়া নাই—অখণ্ড বঙ্গভূমি

জুড়িয়া সব বাঙ্গালা'। তিনি এ প্রসঙ্গে পার্বত্য পুঞ্জি বা পল্লির কথা টেনে বলেন, এসব অঞ্চলে দশ বা পনেরোটি পরিবারের জন্যও এক একটি স্বতন্ত্র ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে রক্তগত, দেশগত বা ধর্মগত প্রভেদ না থাকলেও এই ভাষিক স্বাতন্ত্র এদের মধ্যে 'জাতীয়তার বন্ধন শ্লথ করিয়া অবশেষে গৃহে গৃহে ঘৃণা ও অবিশ্বাসের বীজ ছড়াইয়া দেয়। এইরূপ বাগবৈচিত্র বর্বরতার নিদর্শন।'' তাঁর পরবর্তী বাক্যগুলো এ মুহূর্তে সবার মুখে মুখে ফিরছে- "Barbarism creates languages, civilization destroys them....অসভ্যতাই 'খণ্ডিত' বা উপভাষার সৃষ্টি করে, সভ্যতা সকল উপভাষা সম্মিলিত করিয়া বিরাট জাতীয় ভাষার গঠন করে।"

অগ্নিকন্যা, কবি অনুরূপা বিশ্বাসের কাছে এ কথাগুলো যেন বেদবাক্য। তিনি এখানে ওখানে নানা প্রসঙ্গে ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব মহোদয়ের কথাগুলো উদ্ধার করে বলেন, যারা সিলেটিকে বাংলাভাষা থেকে আলাদা করে অন্য ভাষা হিসেবে দেখাতে চাইছেন এদের জন্য ওই ইংরেজি তকমাই সুপ্রযুক্ত, barbarians। এত কিছুর পরও এখানের কিছু কিছু মানুষ সেই রাজখোয়া মশাইয়ের দোহার দিচ্ছেন যদিও ইতিমধ্যে ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের ভাষাতত্ত্বের মহাগ্রন্থ 'অডিবিওএল' প্রকাশিত হয়ে গেছে এবং এতে ভাষা উপভাষা প্রশ্নের সমস্ত রকম উত্তর দিয়ে সন্দেহের নিরসনও করে রেখেছেন তিনি। নিরন্তর প্রচারের দ্বারা কিছু কিছু লোকের মনে সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা উপলব্ধি করে তরুণ সাংবাদিক অমিত নাগ তাঁর 'সম্ভার' পত্রিকায় 'প্রাচীন কাছাড়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য' নিবন্ধে লিখলেন, 'কাছাড়ের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অবস্থান নিয়ে সম্প্রতি যে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কাছাড়ের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্ক তথ্যমূলক আলোচনা, বিচার বিশ্লেষণ এবং গবেষণার প্রয়োজন অপরিহার্য।' সিলেটি কথ্য এবং অসমিয়া মান্যচলিত ভাষায় কিছু শব্দের সামঞ্জস্য দেখে বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষে নব্য ভাষাতাত্ত্বিকদের প্রয়াস দেখে দেবব্রতবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ভাষাচার্য লিখে পাঠালেন-

"আপনি যে সমস্যার কথা আমার কাছে তুলে ধরেছেন, আসলে তা কোন সমস্যাই নয়, কারণ যে সমস্ত শব্দ আপনি উদ্ধৃত করেছেন, তা সমভাবেই

বাংলা এবং অসমিয়াতে বিদ্যমান রয়েছে। ... এটা শিলচর বা কাছাড় ডায়লেক্টের কোন সমস্যা নয়—তারা এই সব শব্দ পেয়েছেন পূর্ব বাংলার সূত্রে, --সিলেট ও ময়মনসিং এ যা চলতি এবং যেখান থেকে তা কাছাড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।"

আসলে কাছাড়ের বাঙালিদের যে-অধিকার রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে, এ ভাষিক অধিকার বহাল রেখেও ভেতরে ভেতরে কাছাড়ে বাংলা ভাষাকে বিধ্বস্ত করার ভিন্নতর চক্রান্তটা বিচক্ষণ এ অধ্যাপক ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। 'হেড়ম্ব' পত্রিকায় সুনীতিবাবুর ওই প্রকাশিত পত্রের সূত্র ধরে প্রেমেনবাবুর সঙ্গে তাঁর প্রায়ই আলোচনা হয়। কিন্তু সমস্যাটা হল ভাষাতাত্ত্বিকেরা তাঁদের কথা বলবেন, আর শাসকেরা এবং তাঁদের বশংবদরা চলবেন তাঁদের নিজস্ব মতে। কাছাড়ের সমস্যার শেষ নেই। এই যে বলে না, বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। নইলে এসব উদ্ভট ভাষাতত্ত্বের গ্রাহক জুটে যায় কেমন করে!

পাবলিক হাইস্কুলের সহশিক্ষক এ কর্মঠ শিক্ষাবিদ এরই মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এরই অবৈতনিক প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। ইদানীং তিনি অধ্যক্ষ হয়ে এসেছেন নরসিং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে। ভালোই হল দেবব্রতবাবুর। কাছাকাছি যখন এসেছেন তখন ঘন ঘন দেখা হবে দু'জনের।

৭

এদিকে আবার বিরাট দায়িত্ব, 'শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতি'। পুরো জেলা জুড়ে এ সংগঠন। ইতিমধ্যে বিরাট অভিবর্তন হয়ে গেছে। সরকারের কাছে গুচ্ছের দাবিপত্র পেশ হয়েছে। রাজনৈতিক নেতাদের উপর মানুষ খুব বেশি আস্থা রাখছেন না। যা করতে হয় নিজেদেরই করতে হবে। নইলে কাছাড়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবই বা কেন, এবং চটজলদি প্রস্তাব গ্রহণ করে আবার সাময়িক বিরতি দিয়ে এটাকে নাকচ করাই বা কেন? এতেই এদের চিন্তার দীনতা বোঝা যায়। এসব ছেলেমানুষী ভূ-ভারতে আর কোথাও কি কেউ দেখেছে বা শুনেছে? তবে প্রেমেনবাবু আশ্বস্ত, রাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়টি যে আমাদের ঘাড়ে

চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। এতে করে আমাদের নিজস্ব সমস্যা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থাকত। এখন আমাদের দাবি হোক কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

শহরের এক ভাড়াবাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে যা'ও একটা মাথা গুঁজবার ঠাঁই হল, সেটাও ঋণের দায়ে মাত্র দশ হাজার টাকায় বিক্রী করে দিতে হল। প্রেমেন্দ্রবাবুর একটি স্থায়ী আবাস চাই ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়। পাহাড় প্রমাণ ফাইলপত্র, নথি এবং বই পত্রপত্রিকাগুলোকে সংরক্ষণের জন্যও। এই কথা শুনলে ঘরণী নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন না। কিন্তু দিনে দিনে যে বিস্তৃত জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন, কোন ফাইল, কোন নথি কখন বের করতে হবে কে জানে। বাড়ি পাল্টানোর সময় আসবাব নষ্ট হয়েছে, সৌখিন বাসনপত্র, কাপড়চোপড় নষ্ট হয়েছে দুঃখ নেই। কিন্তু কিছু পুরনো নথি, চিঠিপত্র, দেশবাড়ির কিছু অভিজ্ঞান, পিতৃপুরুষের তর্পনের তালিকা এগুলো হারিয়ে খুব হতাশ। আমার বাবা অনেক যত্নে বানিয়েছিলেন মায়ের দিকের এবং নিজের দিকের বিশাল এক তালিকা। ডালপালা যত দিকে গেছে সব দিকে নিজর রেখে এ তালিকা দেখে পিতৃপক্ষে এক একজনের নাম বলে ওঁদের উদ্দেশ্য এক এক ছিপ জল দিতে দিতে দুপুর গড়িয়ে যেত। এরা সব হারিয়ে গেছেন। এ তালিকা যে আমাদের আত্মপরিচয়ের দলিল। যদি একটি স্থায়ী আবাসে সমস্ত কিছু সামলে সুমলে রাখার সুবিধা থাকে তবে জমে ওঠা কাজের বোঝা কিছুটা লাঘব হয়। এসব ভাবতে ভাবতে প্রেমেন্দ্রবাবু এক সকালে পায়ে পায়ে হাঁটছেন আশ্রম রোড পেরিয়ে ধানক্ষেত সংলগ্ন, একটি অঞ্চলে। পছন্দসই বাড়ি করার জন্য একটুকরো জমি যদি পান। বন্ধুবর জ্যোতির্ময় সেন হদিস দিয়েছেন তাঁর এক মুসলিম বন্ধুর, যিনি এ অঞ্চলে ভূ-সম্পত্তির মালিক, এবং এক অতিশয় সজ্জন ব্যক্তিও।

নিজের পাড়ায় স্কুলের প্রিন্সিপাল স্যারকে ইতস্তত হাঁটছেন দেখে ছুটে এল এক ছাত্র, মানিক। -'নমস্কার স্যার। এদিকে কোথায় এসেছেন? আসুন স্যার আমাদের বাড়িতে। এই তো কাছে। একটু বসে যাবেন স্যার।' মাস্টার মশায়দের এই এক ব্যাপার, যেখানেই যান না কেন, একটা না একটা ছাত্রের দেখা মিলবেই। আর আদর আপ্যায়নের কথা তো বলে নেই। তো মানিককে তো আর মনে নেই স্যারের, কিন্তু, সে যে নাছোড়বান্দা। স্যারকে বাড়ির দিকে প্রায় টেনেই আনল। তাঁর হাঁকডাকে বাবাও বেরিয়ে এলেন। 'আমার স্যার' বলে বাবার

সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ছাত্রটি। প্রাথমিক আলাপচারিতার পরে দেখা গেল ইনিই জ্যোতির্ময়বাবুর বন্ধু, মোবারক আলী।

বাবা বললেন, আপনার ছাত্রকে নিয়া ওইদিকে যাইন, নিজে দেখিয়া আইন। যতটুকু জমি আপনার প্রয়োজন তাঁরে দেখাইয়া দেইন। এই সবই আমার পৈত্রিক সম্পত্তি। কোন ভ্যাজাল নেই। আর আপনারা শিক্ষক মানুষ। আপনার সঙ্গে কোন দরদামের ব্যাপার নাই। আপনি দয়া করিয়া আমাদের প্রতিবেশি হইতে চাইতেছেন, এইটাই আমার মূল্য। আপনি তো আর টাকা কড়ি সম্পত্তি বানাইবার পথে চলা মানুষ নায়। আমারও আল্লায় দিলে ট্যাকার খোয়াইস নাই।

বৃদ্ধ মানুষটি জমির দরদাম করতে মোটেই রাজি নন। মাস্টারবাবু যত টাকা দিতে পারবেন ততই নেবেন তিনি হাসি মুখে। পুত্রের স্যার বলে কথা। একটি প্রশস্ত পুকুর, সবজি বাগান, তিনটি আসাম টাইপের ঘর, একটি লেখাপড়ার আলাদা ঘর, একটি ঠাকুর ঘর আর সামনে একটি উঠান। এই তো স্বপ্নের বাড়ি। প্রেমেন্দ্রবাবু উঠে এলেন শহরের কোলাহল থেকে দূরে সরকারি রাস্তার মোটামুটি কাছাকাছি সবুজে ঢাকা বাড়িটিতে। ঘর থেকে বেরিয়ে সড়ক ধরে একটু এগিয়ে গেলেই রিক্সা। এরপর তো শহরের কেন্দ্রস্থলে আসতে কত সময়। তিনি সকাল বেলা তৈরি হয়ে হাতে একটা ব্যাগের মধ্যে একটা ফাইল, দুটো বই, সঙ্গে আরেকটি কাপড়ের ব্যাগ-- ফেরার সময় বাজার করে নিয়ে আসবেন সংসারের জিনিসপত্র। পারতপক্ষে তিনি রিক্সা চড়েন না। ধপধপে সাদা ধূতিপাঞ্জাবি, চক্ চকে পামশু পরে প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামী যখন আশ্রম রোড থেকে গুরুচরণ কলেজের উপর দিয়ে বেরিয়ে জেল রোড হয়ে নরসিং স্কুলে যান, রাস্তার ছেলে ছোকরারা তটস্ত থাকে। তাঁর দৃষ্টি সর্বত্র। স্কুলের হোক, কলেজের হোক, ছাত্রদের চলাফেরায় সামান্য অসংলগ্নতা দেখলে তিনি চুপ থাকার মানুষ নন। কোনো কোনো দিন তিনি আসাম রাইফেলসের রাস্তাও ধরেন। মিশনরোডের মুখটিতে দুটো কৃষ্ণচূড়া গাছ তাঁর বড় প্রিয়। এ গাছকে আরও মোহনীয় করে রেখেছেন শিল্পী বীরেন্দ্রলাল ভৌমিক একটি অনুপম তৈলচিত্রে। নর্মাল স্কুলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তিনি ভাবেন এখানে এক সময় দাপিয়ে বেড়াতেন জগন্নাথ দেব, অঘোরনাথ অধিকারী, ভুবনমোহন বিদ্যার্ণবের মত কৃতি শিক্ষাবিদেরা। এখানে রয়েছে বিজ্ঞানী রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্লেনেটরিয়ামের সরঞ্জাম, দূরবীক্ষণের

ভগ্নাবশেষ, রয়েছে অসংখ্য হস্তলিখিত পুথি, আর রয়েছে বৌদ্ধ মন্দিরের আদলে একটা নির্মাণ, যার চার দিকে একসময় ছিল হরেক রকমের গোলাপ ফুল। এখন এর কিছুই নেই, তবুও এদিকে তাকিয়েই তাঁর তৃপ্তি।

৮

সময়টি ছিল নিশ্চেতনার। যে প্রবল সংগ্রামী মানসিকতা নিয়ে সারা কাছাড় উত্তাল হয়েছিল একদিন, যে প্রবল আবেগের বসে গুলির মুখে দাঁড়াতে এগিয়ে এসেছিল হাজার জনতা, সাংসদ বিধায়কেরা ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির চিন্তা না করেই সদস্য পদ পরিত্যাগ করলেন-- সেই লড়াকু মানসিকতা একটি দশকের মধ্যেই নিস্তেজ হয়ে গেল। কথা হচ্ছিল সুসিত দত্ত আর প্রেমেন্দ্রবাবুর মধ্যে। স্কুল ছুটি হবার পর পরই তিনি গুটি গুটি পায়ে প্রেমেন্দ্রবাবুর কক্ষে এসে বসে রয়েছেন। অধ্যক্ষস্যার হাতের কাজ শেষ করতে করতে চৌকিদারকে চায়ের নির্দেশ দিলেন। সুসিতবাবু বলছিলেন, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, প্রজা সস্যালিস্ট সব দলের প্রতিনিধিরাই সেদিন ভাষার দাবিতে এক হয়ে পদত্যাগ করেছিলেন। এ কথার সুত্র ধরেই প্রেমেনবাবু বললেন, 'লক্ষ্য করুন, আমরা এম-এল-এ আর এম-এমপিদের পদত্যাগের কথা বলি। কিন্তু মহকুমা পরিষদ, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য, সভাপতি এদের কথা বলি না।'

সুসিতবাবু বললেন, 'সত্যিই তো, শিলচর মহকুমা পরিষদ সভাপতি সনৎকুমার দাস তাঁর সঙ্গীসাথী বেশ কয়েকজন সদস্য নিয়েই পদত্যাগ করেছিলেন।'

'শুধু কি তাই? কাটাখাল, বদরপুর, করিমগঞ্জ, পাথারকান্দির বেশ কয়েকজনও এতে সামিল হয়েছিলেন। এর অর্থ হল একষট্টির আন্দোলনের একটা গ্রামীন ভিত্তি ছিল। এই গ্রামীন ভিত্তিটার খুব প্রয়োজন। আমরা তো রাজনীতির মানুষ নই, কিন্তু সাহিত্য সংস্কৃতিরও একটা রুরেল বেইস থাকা চাই।'

সারা দিনের ক্লান্তি ঝেড়ে প্রেমেন্দ্রবাবু উৎসাহের সঙ্গে বলতে শুরু করলেন, 'এই তো সেদিন দলবদ্ধ ভাবে আমরা গেলাম সোনাবাড়িঘাটে। স্কুলের শিক্ষক অশোক বার্মা আর তপোধীরও ছিল সঙ্গে। ওখানে তাজউদ্দিন, আইনুল হক—এদের নিয়ে বৈঠকে কবিতা, গল্পপাঠ, প্রবন্ধ পাঠ আর কত বিষয় নিয়ে

আলোচনা হল। আর শেষে বিরইন পিঠার স্বাদ নিয়ে ফিরে এলাম। আপাতত দৃষ্টিতে ব্যাপারটি কিছুই না, কিন্তু বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এটা একটা বড় পদক্ষেপ। আমার তো মনে হয় রাজনৈতিক নেতা নয়, আমাদেরও অনেক কিছু করার আছে।’

বিকেল গান্ধী শান্তিপ্রতিষ্ঠান কক্ষে উপস্থিত হলেন কাছাড় কলেজের অধ্যক্ষ দেবব্রত দত্ত, গুরুচরণ কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রাক্তন এম, এল, এ মেহেরোব আলি লস্কর, শিলচর পৌরসভার প্রাক্তন সভাপতি মহীতোষ পুরকায়স্থ। এলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী শিশুসাহিত্যিক জ্যোতির্ময় সেন, অধ্যাপক জগন্নাথ রায়চৌধুরী, শিক্ষক নৃপেশ গোস্বামী, প্রসূনকান্তি দেব, অধ্যাপক বিজিৎ চৌধুরী, সাংস্কৃতিক কর্মী অনন্ত দেব, মৃণালকান্তি দত্তবিশ্বাস, প্রভাস সেন মজুমদার, কবি অনুরূপা বিশ্বাস, সুখরঞ্জন চন্দ, প্রধানশিক্ষক প্রভাত চন্দ। বিশিষ্ট আইনজীবী প্রিয়নাথ দেব, অনিল বিশ্বাস, দিলীপ দে, ব্যারিস্টার গোলাম ওসমানী আসতে পারেন নি, কিন্তু সভার সিদ্ধান্ত যা হবে এতে তাঁদের সহমত থাকবে জানিয়েছেন।

আহ্বায়কের পক্ষ থেকে প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামী সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে কাছাড়ের সাম্প্রতিক অবস্থা, শিক্ষা ও সামাজিক জীবনে বাংলাভাষার অবস্থান, একষষ্টির আন্দোলন, বাহাত্তরের আন্দোলন, দিল্লি-দিসপুরের রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি প্রসঙ্গ টেনে বাংলা ভাষা এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের মান উন্নয়নের জন্য একটি নিজস্ব স্থায়ী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য শেষ করলেন।

সভার পক্ষ থেকে প্রেমেন্দ্রবাবুদের জোড়হাট অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু আলোকপাত করতে বলা হলে তিনি বার কয়েক এদিক ওদিক তাকালেন। না করুণারঞ্জন, না শক্তিপদ— কেউই এলেন না। অশোক বার্মাকে খবর দেওয়া গেল না। প্রভাতবাবু অবশ্য চুপ চাপ বসে শোনাই পছন্দ করেন। প্রেমেনবাবু এত বিস্তারিত কিছু বলতে চাইছেন না। সর্ব ভারতীয় সংগঠনটির সদস্য এ শহরে আরও আছেন। ওই সংগঠনটির কার্যপদ্ধতি ভিন্ন হলেও ওঁরাও বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়েই কাজ করছেন। এরা তো আমাদের সহযোগীও। এসব বিবেচনা করে শুরু করলেন, ‘আমি একটিই কথা বলব, জোড়হাট যাত্রা আমাদের

চোখ খুলে দিয়েছে। বুঝতে পারছি নিখিল ভারতের মতোই নিখিল কাছাড় বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন বা এই রকম একটি কিছু আমরা করতে পারি, নাম আপনারাই ঠিক করবেন। এটা খুব জরুরি। কাছাড়ের নানা জায়গায় এর ইউনিট হবে, কেন্দ্রীয় কমিটিতে তৈরি হবে নীতি এবং কর্মসূচি। আর সংগঠনটি হবে সার্বিক-- শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, সমাজ সমস্ত বিষয়ই এখানে চর্চিত হবে।'

প্রাক্তন ছাত্রনেতা, করিমগঞ্জের লড়াকু ব্যক্তিত্ব সম্প্রতি গুরুচরণ কলেজে শিক্ষকতা কচ্ছেন বিজিৎ চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন, 'করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দিতেও সমমনস্ক মানুষ রয়েছেন। এদেরও ডাকা উচিত ছিল। আর, সব সম্প্রদায়ের মানুষকে সামিল করা প্রয়োজন। বাংলা ভাষার আন্দোলনে অবাঙালিরা সহযোগিতা করেছে। এদের বাদ দিয়ে কি সংগঠন করা উচিত হবে?'

দেবব্রতবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'এই তো সংগঠনের মূল কথা। সংগঠনের মানসিক বিস্তৃতির উপরই এর শক্তি নির্ভর করে। সংকীর্ণতা নিয়ে কোন স্থায়ী সংগঠন হয় না। আর হলেও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বড়ো ক্ষতিকর। এই যে আসামটা ভেঙে টুকরা টুকরা হচ্ছে, এর মূলেও সেই সংকীর্ণতা। আমার প্রচুর জনজাতি মানে ট্রাইব্যাল ছাত্র আছে। এদের সঙ্গে কথা বলে আমি তাঁদের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করি। এরা সবাই'ই কালচারেল ইন্টিগ্রেশনে বিশ্বাসী। বাংলা ভাষার সঙ্গে এদের একটা মমত্ব তৈরি হয়ে গেছে। একষট্টিতে ওঁদের যে অংশগ্রহণ, এর প্রতিদান হিসেবে বাঙালিরা যদি তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং উন্নতিতে সহযোগিতার হাত বাড়ায় তবেই আমাদের সংগঠন নিজস্ব ভূমিকা নিতে পারবে। কী বলেন মেহেরাব আলি সাহেব?'

শান্ত সৌম্য চেহারার নিশ্চুপ সুন্দর ব্যক্তিটি এতক্ষণ যেন ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তিনি বললেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী এটা প্রথমেই নির্ধারণ হয়ে যাওয়া বোধহয় দরকার। এইটা তো আর এক দুই দিনের ব্যাপার নয়, একটা স্থায়ী জিনিস। তাই কর্মপদ্ধতি স্থির করার আগে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিরূপিত হোক।'

প্রেমেন্দ্রবাবুর বুক পকেট থেকে একটা কাগজ বের হল। তিনি সভাকে আশ্বস্ত করলেন, 'হ্যাঁ এইটা ঠিকই বলেছেন মেহেরাব আলি সাহেব। আমি

এখানে কয়েকটা পয়েন্ট লিখে এনেছি। আপনারা সবাই মিলে দেখুন এবং এতে সংযোজন, সংশোধন, পরিবর্তন করুন।'

দেবব্রতবাবু বললেন, 'এই কর্মে বিভিন্ন ভাষাভাষীর অংশগ্রহণও সূচিত হয় এটাও লক্ষ্য রাখবেন।'

বিজিৎ চৌধুরী কাগজটি হাতে নিয়ে চোখ থেকে চশমাজোড়া খুলে টেবিলে রাখলেন, এরপর ভ্রু কোঁচকে অনেকক্ষণ দেখলেন। চশমাটা চোখে লাগিয়ে বললেন 'অনেকটা প্রিয়েম্বল টু দ্যা কনসটিটিউশন অব ইন্ডিয়ার মতো। খুব ভালো হয়েছে। এই কথাগুলো আমাদের সমস্ত মুদ্রিত প্রচারপত্র বা পুস্তিকায় মোটা অক্ষরে থাকবে।' এবার দম নিয়ে বললেন, 'এর উপর ভিত্তি করেই আমাদের কর্মসূচি এমনকি সংবিধান রচনাও হবে।'

মোট এগারোটি দফার মধ্যে প্রথম দফাটি সর্বান্তকরণে গৃহীত হলে পর বাকিগুলো নিয়ে আর কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব রইল না। প্রথম বাক্যটি হল-'কাছাড় বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন একটি একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক, অপেশাদার, অরাজনৈতিক সংস্থা'।

অনন্ত দেব বললেন, 'এই সংগঠনে যে-কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী অংশগ্রহণ করতে পারবেন। মানে, সবার জন্যই দরজা খোলা থাকবে, কিন্তু—।' সঙ্গে সঙ্গে বিজিৎ চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু?'

'হ্যাঁ এইখানে একটা কিন্তু আছে। এইখানে এলে নিজের রাজনৈতিক ইউনিফর্ম খুলে ঢুকতে হবে। এইটা একটা কমন প্ল্যাটফর্ম, কিন্তু অরাজনৈতিক।'

বিজিৎ চৌধুরী তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'তবে আপনি কী করবেন? মানে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। আপনার যে গায়ে একটা রাজনৈতিক ছাপ আছে।'

'রাজনৈতিক ছাপ', একটু থেমে অনন্তবাবু বললেন, 'আরও অনেকেরই আছে। তবে এখানে আমার প্রথম এবং শেষ আনুগত্য কোন দলের প্রতি নয়, কোন মতাদর্শের প্রতিও নয়। আমি মনে করি আমাদের দায়বদ্ধতা থাকা উচিত

বাংলা এবং বাঙালিত্বের প্রতি। এইখানে আমরা কেউই কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, হিন্দু বা মুসলিম কিছুই নই। আমাদের একটিই পরিচয়- আমরা বাঙালি।'

এই কথা বলে বরিষ্ঠ আইনজীবী প্রভাস সেনমজুমদারের দিকে তাকালে তিনি তিনি উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন, 'ঠিকই। এইখানে কোন ধরনের রাজনীতি টানা উচিত হবে না। তবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত মানুষদের অংশগ্রহণ তো থাকবে।' সবাই তীর্যক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন- 'বলুন তো, আমরা মহীতোষবাবুকে ছাড়া এরকম কোন সংগঠন কি করতে পারব? তিনি কতটা কবিতা লিখেছেন বা পড়েছেন, এইটা কোন ব্যাপারই নয়, ব্যাপার হল বাংলা ভাষার প্রতি—', সংযোজন করলেন শিক্ষক প্রসূনবাবু, 'এবং বাঙালির প্রতি তাঁর দরদ কতটুকু। আর, এজন্য কতটুকু ত্যাগ তিনি স্বীকার করতে পারেন।'

বিজিৎ চৌধুরীর সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা আছে। ডান বাম সব সংগঠনের সঙ্গে তাঁর সখ্য। তিনি জানেন কা'কে আনলে সংগঠন শক্তিশালী হবে, আর এটাও জানেন কে ব্যক্তিগত লাভের জন্য সগঠনে আসতে চাইবেন।

সভাপতি দেবব্রতবাবু আলোচনাকে সমাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে যাবার লক্ষে বললেন, 'দেখুন সব কথা যদি একই বৈঠকে শেষ করে ফেলুন, তবে আবার বসব কী বাহানায়? আমার একটি কথা খুব ভাল লেগেছে। কই দেখি, কাগজটা দিনি তো—ওঃ, এই যে লিখেছেন অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্য গোষ্ঠীর সঙ্গে অনুরূপ সম্পর্ক স্থাপন করা—ইত্যাদি। এ না হলে এ সংঠনও সংকীর্ণতার আবর্তে পড়ে যাবে। নিজের ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রতিবেশি ভাষিকগোষ্ঠীর অধিকারের প্রতি সহমর্মিতার প্রয়োজন। ভাষাপ্রেমজনিত হিংসার অনুশীলন কিন্তু আমাদের রাজ্যে বারবারই আগুন জ্বালিয়েছে। কাছাড় যেন এর বাইরে থাকে।'

সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, এই শীতেই একটি অধিবেশন হবে, এবং এই অধিবেশনের মাধ্যমে সম্মেলন আত্মপ্রকাশ করবে। সুসিতবুকে সম্পাদক করে এবং প্রিয়নাথবাবুকে সভাপতি করে কাছাড় বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হোক। কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য প্রস্তাব করলেন পরবর্তী সভাটি অনুষ্ঠিত হোক সংগীত বিদ্যালয়ে এবং ঠিক হয় ওই সভায় কার্যনির্বাহী কমিটি, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি কমিটি গঠন, আগামী কার্যসূচির রূপরেখা এবং

সংবিধানের খসড়া এসব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে সেদিনের সভায় শ্রী প্রিয়নাথ দেব সহ শহরের বিশিষ্ট আইনজীবীরাও যেন উপস্থিত থাকতে পারেন তাই তাঁদের সঙ্গে কথা বলেই যেন তারিখ নির্ধারণ হয়।

প্রস্তাবিত সম্মেলনের পাহাড় প্রমাণ প্রাথমিক কাজের বোঝা মাথায় নিয়ে বাড়ি গেলেন প্রেমেন্দ্রবাবু, সুসিত দত্ত, অনন্ত দেব, প্রভাস সেনমজুমদার। তবে সভা ভঙ্গ হবার আগেই বিজিৎ চৌধুরী বললেন, 'কা'কে কী দায়িত্ব দেওয়া হবে জানি না, তবে কোষাধ্যক্ষ পদে আমি সুখরঞ্জন চন্দ মহাশয়ের নামটা প্রস্তাব করে রাখলাম। এরকম নীরব, নিষ্ঠাবান ট্রেজারার আর কোথাও পাবেন না। তহবিলে এগারো শো পঁচাত্তর টাকা আট আনা থাকলে তিনি নিজের পকেট থেকে আট আনার রুমাল কিনে ওই আধুলিটি বেঁধে নিয়ে হিসাব দাখিল করেন।'

৯

একটা জিনিস প্রেমেন্দ্রবাবুর কাছে খুব স্বস্তির, একষট্টির আন্দোলনে যে একটি প্রতি-আন্দোলনের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র ছিল বাহাত্তরে এদিক থেকে কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখা যায়নি। এর মূলে অবশ্য স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ, যার সূত্রপাত সেই বাহান্নর ভাষা আন্দোলন। এবার একষট্টির উনিশে মে'র বিপরীতে উনিশে জুনের কোন কলঙ্কিত অধ্যায়ের সংযোজন নেই। কংগ্রেসি গুণ্ডাবাহিনীর হাতে একটি তাজা প্রাণ গেলেও বাঙালি সংযম রক্ষা করেছে প্রথমাবধি। নানা প্রলোভন থাকলেও বাঙালির মধ্যে ধর্মীয় ভেদাভেদ অনেকটাই অপসারিত হয়েছে। মুসলিম সমাজে বিগত একটি দশকে শিক্ষার হার বেড়েছে। চাকুরি, ব্যবসা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও মুসলিম সমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। লক্ষণীয়, স্কুলগুলোতে মুসলিম মেয়েদের সংখ্যাবৃদ্ধিও এখন চোখে পড়ার মতো। এমনি করে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন এসে গেছে। এবার আর শহরতলীতে পাকিস্তানি পতাকা তোলার কোন দুষ্টচক্র নেই। একষট্টির আন্দোলকে দুর্বল করতে যাদের কাজে লাগানো হয়েছিল, বাহাত্তরে এদের নতুন প্রজন্ম বিপুল সংখ্যায় বাংলা ভাষার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। উনিশে মে'র বিপরীতে উনিশে জুনের প্রত্যাহ্বানকে আজ প্রতিহত করেছে বাঙালির সমবেত প্রয়াস। প্রেমেন্দ্রবাবু মনে মনে বলেন 'আমি যে গ্রাম গ্রামান্তরে সাহিত্য বৈঠক

নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলাম এর প্রত্যক্ষ ফল তো এবার দেখা গেল' এ নিয়ে এখানে ওখানে বাগাড়ম্বর এবং নিজেকে গৌরবান্বিত করার মানুষ অবশ্য তিনি নন।

একষট্টিতে পূর্ববঙ্গের মানুষ আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। করিমগঞ্জে বোর্ডারে ওপার থেকে মাইক লাগিয়ে ওঁরা ভাষা আন্দোলনে সাহস জুগিয়েছে। একাত্তরে আমরাও তাঁদের পেছনে দাঁড়িয়েছি। ওইসব দিনের কথা ভাবলে প্রেমেন্দ্রবাবুর শরীরে শিহরণ জাগে। দিনগুলো আমাদের জন্য কোন সুখের ছিল না। কিন্তু আমরা হাসি মুখে সব মেনে নিয়েছিলাম। স্কুল কলেজে ওদের আশ্রয় দিয়েছি, ওদের পাশে দাঁড়িয়েছি। গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে আমরা জয়বাংলার আত্মপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছি। রেডিওতে সেই দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিক্রমা, আনন্দবাজার, যুগান্তরের অগ্নিবর্ষী সম্পাদকীয় আমাদের রক্তে উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছিল। মনে আছে সেই মধ্যরাতের কথা, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেন, আমরা সারা রাত জেগে কাটিয়েছি। হঠাৎ দেখা গেল রেডিও পাকিস্তান ঢাকার অবিরাম মিথ্যাচার স্তব্ধ, আর হাওয়ায় ভেসে আসতে থাকল 'একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠে' বাংলার জয়গান। শতকণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকল 'আমার সোনার বাংলা', সকাল দুপুর সন্ধ্যায় শোনা গেল 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'।

কলেরা, মহামারি, চোখের রোগ, সবাই বলত 'জয়বাংলা', এসবকে উপেক্ষা করে আমরা উল্লাসে মেতে উঠলাম। সেই দিনগুলোতে আমরা চোখের জলে ভেসেছি অজানা মুক্তিসেনার মৃত্যুসংবাদ শুনে, প্রার্থনা করেছি মুজিবর রহমানের মুক্তির জন্য।

বাংলাদেশ আমাদের এপারেও নবপর্যায়ে একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। ভাষাপ্রেম যে একটা স্বাধীন সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্রর জন্ম দিতে পারে এটা আমাদের কাছে এক বিস্ময়। কেউ কি ভাবতে পেরেছিল পাক-বাংলার এ উত্তরণ ঘটবে? এপারের বাঙালির মনেও তাই নতুন করে ভাষাচেতনার জন্ম হল।

প্রেমেন্দ্রমোহন অভ্যাসবসত 'কমলা বুক স্টলে' গেলে দোকানের মালিক অতীন ঘোষবাবু হাতে ধরিয়ে দিলেন একটি ছোট্ট কবিতার বই। 'অনেকটি কপি এসেছিল, সব বিক্রী হয়ে গেছে। আপনার জন্য এই একখানা লুকিয়ে রেখেছি। এই নিন' বলে এগিয়ে দিলেন জীবনানন্দ দাসের 'রূপসী বাংলা'। প্রেমেন্দ্রমোহন বুঝতে পারলেন এটা সেই গানের প্রভাব—'বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা রূপের যে তার নাই কো শেষ'। পাঁচসিকে মূল্যের সবুজ মলাটের বইটির একটি পাতা উল্টাতেই বেরিয়ে পড়ল কবিতাটি, কয়েকদিন আগেই সংবাদ পরিক্রমায় দেবদুলাল উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন, 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'। একটা অসহ্য অনুভূতিতে প্রেমেন্দ্রমোহনের সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এ কী উচ্চারণ! বইটি তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে প্রেমেন্দ্রমোহন বাড়িমুখো হাঁটা দিলেন। তারপর--।

সারারাত প্রেমেন্দ্রমোহন দুই চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। পঁঞ্চাশ-ষাট পাতার একটি বইয়ের মধ্যে এত আগুন লুকানো। জীবনানন্দ দাসের এই বিষাদ মাখানো মগ্নভগ্ন নীরব কণ্ঠ কী উন্মাদনাই না জাগিয়ে দিতে পারে। চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠতে থাকল ডুমুর গাছের নীচে বসে থাকা ভোরের দোয়েল পাখি, বাংলার নারীর চাল ধোয়া স্নিগ্ধ শাদা হাত, ধানসিঁড়িটির তীরে অজস্র বাংলার ঘাস, শালিক-খঞ্জনা আর বৌ কথা কওটির ছানা, কার্তিকের ভোরের কাক, নাটাফল-বেতফল-আকন্দ-ধুন্দুলের সারি। বার বার মনে আসছে ধর্মদা গ্রামে বাড়ির আশপাশে উড়ে চলা কাচপোকা, শ্যামাপোকা, গঙ্গাফড়িং, শিশিরের জলে ভেজা চালতা ফুল আর মধ্যরাতে ডেকে ওঠা লক্ষ্মীপেঁচা। এরা সবাই তাঁর কত আপনজন। কী করে এতদিন এদের ছেড়ে এত দূরে পড়ে আছেন? শৈশবের কত ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। ফরিদ, নিজাম, গৌরাঙ্গ, নবীনদের সঙ্গে সেই স্বরূপ খালের ওপারে বেতের ফল, তুতফল, মাঠাং খুঁজতে বের হতেন। মনে এল সেই সব দিনের কথা-- জোনাকী ধরে কয়ফলের ডাঁটার ভেতর ঢুকিয়ে অন্ধকার দূর করে সন্ধ্যারাতে পথ চলার কায়দা-- শিখিয়ে দিয়েছেন পাড়ার বেণুধরদাদা। রূপসী বাংলার এক একটা পঙক্তির ভেতর যে লুকিয়ে আছে এক একটা ইতিহাস।

তিনি শুনেছেন মর্টার মেরে গুড়িয়ে দেওয়া মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প থেকে উদ্ধার হয়েছে কয়েকটি মৃতদেহ। এদের একজনের পিঠে সাঁটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে পাওয়া গেছে একখণ্ড 'রূপসী বাংলা'।

দূরে কোন উঁচু গাছের ডালে বসে রাতের পেঁচা একবার ডেকে উঠেই চুপ করে গেল। প্রেমেন্দ্রমোহন বইটি মুড়ে রাখতে রাখতে মনে মনে বললেন, 'ডেকে যাও প্রাণ ভরে, আজ আর তোমাকে কেউ দূর দূর করে তাড়াবে না, তুমি আমার রূপসী বাংলার লক্ষ্মীপেঁচা।' মনে মনে উচ্চারণ করলেন—'পৃথিবীর বুকে হারাবো না আমি তারে, সে যে আছে আমার এ বাংলার তীরে'। তারপর কোন একটা সময় দু চোখ জড়িয়ে ঘুম এসে তাঁকে নিয়ে গেল আম জাম কাঁঠালের অশ্বত্থের হিজলের বনে জোনাকির স্নিগ্ধ আলোয়।

বাংলাদেশে যুদ্ধের পর কাছাড়ের একটি প্রাপ্তিও ঘটল, মন্ত্রী মহীতোষ পুরকায়স্থের হাত দিয়ে একদিন সত্যিই উদ্বোধন হল আকাশবাণীর শিলচর কেন্দ্র। কলকাতা, শিলিগুড়ি, কার্সিয়াং আর আগরতলার দুর্বল ট্রান্সমিশন নিয়ে এখানকার শ্রোতাদের বিব্রত হওয়ার দিন অবসান। আগে রেডিওর নব ঘুরিয়ে বাংলা সংবাদ, কয়েকটি গান, সাপ্তাহিক নাটক, পঙ্কজ মল্লিকের সংগীত শিক্ষার আসর শুনতে যে কী কঠিন ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হত। এখন সকাল, দুপুর আর সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে অজস্র বাংলা গান। গ্রামেগঞ্জে রবীন্দ্র-নজরুল-অতুলপ্রসাদ-ডিএল রায়, রাধারমণ, হাসনরাজার পদ। স্থানীয় শিল্পীরা রেডিওতে লোকগীতি, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি গাওয়ার সুযোগ পেলেন। পঞ্চাশ ষাটের দশকে যে সব গান রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছিল যা কেবলমাত্র কলের গানের মালিকরাই শুনতে পেতেন, এখন রেডিও বাহিত সেই হেমন্ত-সন্ধ্যা, লতা-আশা, প্রতীমা-নির্মলা, মানবেন্দ্র-শ্যামল মিত্রদের কালজয়ী গানগুলো সবার ঘরে ঘরে উপচে পড়ল। দেবব্রত বিশ্বাস, কণিকা-সুচিত্রার রবীন্দ্রসংগীত রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল, এগুলো কাছাড়ে নতুন করে জনপ্রিয়তা লাভ করল। কাছাড়ের মাটিতে কাজি নজরুলের গজল, ভজন, কীর্তন, শ্যামাসংগীত, পল্লিগীতি আর স্বদেশি গান জীবন্ত হয়ে উঠল।

স্থানীয় সাহিত্যিকেরাও আমন্ত্রিত হয়ে যাওয়া শুরু করলেন আকাশবাণীতে, কবিতা গল্প পাঠ করতে। এতদিন সাপ্তাহিক পত্রিকার ক্রোড়পত্র, অনিয়মিত

সাহিত্য পত্রিকা আর ঘরোয়া আসর ছাড়া লেখকদের প্রকাশের কোন মাধ্যম ছিল না। এখন রেডিওর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে মাইক্রফোনের সামনে কবিরা কবিতা পাঠ করলে তাঁদের কণ্ঠ ধরা পড়ে হাজার শ্রোতার শ্রবণযন্ত্রে। গ্রামেগঞ্জে জনপ্রিয় হয়ে উঠল চাষআবাদের কথা। স্বর্ণকণ্ঠী তফজ্জুল হোসেনের অড়হড় ডাল চাষ, সবজি ক্ষেতে মাজরাপোকার আক্রমণ, আনিপুর নিবিয়ায় কুশিয়ার ক্ষেতে পোকার আক্রমণ, গরুমহিষের বাতারোগের বৃত্তান্ত শুনতে গ্রামীন চা স্টলে মানুষের ভিড় বেড়ে গেল।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে আকাশবাণীর কেন্দ্রঅধিকর্তা স্বাক্ষরিত আমন্ত্রণ হাতে পেয়ে প্রেমেন্দ্র গোস্বামী ভাবলেন এটা ভাষা শহিদেরই জয়। তিনি 'কাছাড়ে সাহিত্যচর্চা' শীর্ষক কথিকা নিয়ে গেলেন ট্রাঙ্ক রোডে আকাশবাণীর স্টুডিওতে। শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দির ঘরে ঘরে ধ্বনিত হল সদ্য প্রয়াত রবীন্দ্রসান্নিধ্যধন্য সাহিত্যিক নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম মহোদয়ের নাম, মানুষ শুনল 'ভবিষ্যৎ', 'সপ্তক' পত্রিকার নাম। প্রেমেন্দ্রবাবুর কথনে মূর্ত হল কবি অশোকবিজয় রাহার কবিতায় কাছাড়ের প্রাকৃতিক শোভা, ডলু লেকের মনোরম চিত্রকল্প। 'পক্ষীরাজ' খ্যাত শিশুসাহিত্যিক জ্যোতির্ময় সেন 'শীতের শিলচর' কথিকায় শোনালেন উনবিংশ শতকে শিলচরের সাহেব-মেমদের জমকালো এক্সমাস উৎসবের কথা। আজকাল প্রেমেন্দ্রবাবু সন্ধ্যাবেলা রেডিওটি চালু রেখে দেন, পাছে কোন ভালো অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হয়ে যান। এমনি এক সন্ধ্যায় তিনি অবাক হয়ে শুনলেন দেবব্রত দত্ত মশাইয়ের পুরনো কাছাড়ের আইন আদালতের উপর সরস এক কথিকা। আজও কানে বাজে সেই সরস কথন, আমন্ত্রিত লাইসেন্স প্রার্থীদের মাটিতে জাজিম পেতে বসতে দেওয়া হলে পর সাহেব বললেন 'ইন সবকো ভকিল বানা দো', আর সেদিন থেকে এরা হয়ে গেলেন ভকিল', ঘটনাটি ১৮৩৪-৩৫ সালের। রসসাহিত্যিক গণেশ দে, হীরেন্দ্রকুমার গুপ্তর সরসকথন মাঝে মাঝেই বেতার তরঙ্গে ভেসে আসতে থাকল। অধ্যাপক জগন্নাথ রায়চৌধুরী এমনই পূজার ঠিক আগে আগে এক সন্ধ্যায় হাজির হলেন কথিকার আসরে। তাঁর বিষয় 'পূজাসংখ্যা'। খুব সরস ভঙ্গিতে বলে গেলেন কী করে দুপুর বেলা শুয়ে শুয়ে 'দেশ', 'অমৃত' আর 'নবকল্লোলে'র পাতায় শক্তিমান ট্রাক, সিলভারপ্রিন্স ব্লেইড, কুকমিগুড়ো মশলা,

জনতা স্টোভ, লক্ষ্মীবিলাস তৈল আর মারফি রেডিওর বিজ্ঞাপনের বয়ান পড়ে পূজার বন্ধ কাটিয়ে দেবেন এবার। এই তো শুরু, দেখতে দেখতে কাছাড়ের নতুন প্রজন্ম কলম হাতে এগিয়ে আসল বলে। বাঙালির সৃজনধারার উৎসারণটি প্রত্যক্ষ করে প্রেমেন্দ্রবাবু নতুন উদ্যমে তাঁর আরব্ধ কাজে মনোনিবেশ করেন।

১০

ইদানীং প্রেমেনবাবু একটা জিনিস খুব লক্ষ করছেন, আমাদের জনপ্রতিনিধিরা আবার তাঁদের আগের অবস্থানে ফিরে যাচ্ছেন। রাজ্যস্তরের যে সব নেতারা কাছাড়ের প্রতি মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন, এদেরই কৃপাপ্রার্থী হয়ে এরা আবার রাজধানীর আশেপাশে ঘোরাঘুরি শুরু করেছেন। যাঁরা রাজ্যের শীর্ষ নেতাদের বিমাতৃসুলভ আচরণের প্রতিবাদে একটা সময় কিছুটা উচ্চবাচ্য করেছিলেন, এরাও এখন তাঁদের তুষ্টিবিধানে নীরবতা পালন করছেন। তবে যুবনেতা পরিতোষ পালচৌধুরি একই লক্ষ্যে স্থির রয়েছেন-- কাছাড়কে আসাম থেকে বের করে আনা। থাক না ওঁরা সুখে নিজেদের অধিকার নিয়ে আসাম ভ্যালিতে। আমাদের সঙ্গে আর বিবাদে কাজ নেই। একসঙ্গে থাকার যে মানসিকতা এটা ওঁদের অর্জন করা হয়ে ওঠেনি, তাই তো মণিপুর, নাগারাজ্য আসাম থেকে প্রথম চোটেই বেরিয়ে গেল। না চাইলেও একদিন আমাদের ওঁরা ঘাড় ধরে বের করে দেবে। আর যদি না বের করে দেয় তবে সমস্ত অধিকার কেঁড়ে নিয়ে ক্রীতদাসের মতো রাখবে, এ আমি বলে দিলাম।

পরিতোষের মুখের কোন রাখঢাক নেই, 'কথায় কথায় যারা হেংডাং হেংডাং বলে, এদের আর কী করে বিশ্বাস করব?'। প্রেমেন্দ্রবাবুর বাড়িতে বসে বলছিলেন এক অভিজ্ঞতার কথা, 'গিয়েছিলাম নওগা জেলায়। হেংডাং শব্দটি দেওয়ালের গায়ে লাল রঙ দিয়ে লেখা দেখে একে ওঁকে জিজ্ঞেস করি, এর অর্থ কী? কী করে হেংডাং দিয়েই আসামের সমস্যা সমাধান করা যাবে জানতে চাইলে সবাই এড়িয়ে যায়।'

প্রেমেন্দ্রবাবুও এ শব্দটির মানে জানতেন না। এখন জেনে বিমর্ষ হয়ে গেলেন। সভ্যসমাজে এরকম খড়্গা দিয়ে সমস্যা সমাধানের প্রকাশ্য আস্ফালন! পরিতোষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার দিনে দিনে পূর্ণ হচ্ছে। সে বলছে, 'স্যার, এ

হিংসার পরিস্থিতি একদিনে তৈরি হয়নি। অনেক বড় বড় মানুষ, বিদ্বান, চিন্তাবিদ ব্যক্তিও পেছনে উসকানি দিয়ে চলেছেন। আমি আগে তো এত কিছু জানার সুযোগ পাইনি, এখন ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব নিয়ে কিঞ্চিৎ ঘাঁটাঘাটি করতে হচ্ছে। এটা আমার ভাবনায় ছিল আসামের এই হিংসার রাজনীতির পেছনে বড় মাথা কাজ করেছে। নইলে স্বাধীনতার পরপরই কেন বাঙালিদের প্রতি এ পৃষ্ঠ প্রদর্শন।' পরিতোষের আক্ষেপ, এরা ভুলে গেলেন আসমিয়া বাঙালির গভীর ভ্রাতৃত্বের কথা, বিশেষ করে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়। এই শিলচর কেন্দ্রীয় কারাগারে আমাদের সতি-যতি-সনৎ ত্রয়ীর সঙ্গে বন্দিজীবন কাটিয়েছেন আসামের তাবৎ নেতারা-- তরুণরাম ফুকন, কুলধর চালিহা, বিষ্ণুরাম মেধী। সেদিন আকাশবাণীর শিলচর কেন্দ্রের একটি অনুষ্ঠানে জেলের ভেতর এদের সঙ্গে একত্র বাস, স্বাধীনতার শপথ, পারস্পরিক ভালোবাসার স্মৃতিচারণ করেছেন ১৯২১ সালের সত্যাগ্রহী জমিদার যতীন্দ্রমোহন। এসব নিয়ে অনেক কথা বলে গেলেন পরিতোষ পালচৌধুরি। যাদের সঙ্গে একদিন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এরা ইংরেজ বিতাড়ন করতে নেমেছিলেন, সেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরই এদের আচরণ হয়ে গেল প্রভুর মত। পরিতোষের ফাইলের ভেতর থেকে বেরোল আরও কিছু কাগজ, প্রচারপুস্তিকা, পুরনো পেপারকাটিং। 'কবি সাহিত্যিকেরা যদি হিংসার রাজনীতিতে ইন্ধন জোগান তবে আমাদের আর কী করার থাকতে পারে?'

'কার কথা বলছ তুমি?'

'অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরি। তিনি তো বহু আগে থেকেই বিষোদ্গার করে চলেছেন। কাছাড় না হলেও অন্তত হাইলাকান্দিকে পাকিস্তানে পাঠানো হোক, এ তার ইচ্ছে।'

এ বিক্ষুব্ধ যুবনেতা বলে চলেছে কোথায় রাজধানী থেকে ছাত্রবৃত্তির উপর এমন শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে বাঙালিরা সহজে এর সুবিধা পেতে পারে না। কোথায় বাঙালি অধ্যুসিত অঞ্চলে একের পর জঘন্য আক্রমণ সংঘটিত করছে সরকার মদৎপুষ্ঠ গুণ্ডাবাহিনী। কোথায় গেল গেল সেই সত্যাগ্রহ, ধর্মঘট, গান্ধীজির দর্শন, ভারত ছাড় আন্দোলনে সমবেত জনতার ঐক্যের শপথ, ভারত ভাগ্যবিধাতার পায়ে বন্দেমাতরম সংগীতাঞ্জলি? এখন তো আমাদের রক্তাঞ্জলি

দেবার পালা। রাজ্যের সর্বজনমান্য পণ্ডিতেরাই ঘোষণা করে বসলেন, 'প্রতিটি অন-অসমিয়াই আসামে বিদেশি'। এ অবস্থায় সাধারণ মানুষ আর কী করে নিজেদের দাঙ্গা থেকে বিরত রাখতে পারে? আসামে আর 'গান্ধী গান্ধী' বলে খুব লাভ নেই। এ মহান ব্যক্তির প্রতি আসামবাসীর ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধও নেই। তিনি যে বলেছিলেন— ইফ আসাম ইজ ফর এসামিজ, বিহার ফর বিহারিজ...ইন্ডিয়া ফর হুম?' এটা যে সারা ভারতে রাষ্ট্র হয়েছে, এতে নাকি ওঁদের খুব গোঁসা"

তরুণ এ নেতার প্রতি প্রেমেন্দ্রবাবুর একটা মমত্ব তৈরি হয়ে গেছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা। তিনি নিজেও নেতাজি ভক্ত। পরিতোষ এখনও বিশ্বাস করে সুভাষ বসু একদিন ফিরে আসবেন। নেতাজির বয়স এখন সত্তরের কোঠায়, তেমন আর কী বয়স? তাঁর বেঁচে থাকার সপক্ষে পরিতোষের অনেক যুক্তি। প্রেমেন্দ্রবাবু মন দিয়ে সব শুনে যান আর ভাবেন একটা আদর্শের অবলম্বন না থাকলে দেশের তরুণ-যুব সমাজ টিকবেই বা কী করে? নেতাজি বেঁচে আছেন এই স্বপ্নকে তিনি নিজেও তো আঁকড়ে ধরে থাকতে চান।

কিছুদিন পর পরিতোষ পালচৌধুরি ফাইলপত্র নিয়ে তাঁর বাড়িতে হাজির, 'আমরা ইউনিয়ন টেরিটোরির দাবি নিয়ে আবার আন্দোলনে নামতে চাই। পড়ে পড়ে মার খাবার দলে আমরা নই। আপনাদের আশীর্বাদ চাই'।

১১

কাছাড় পৃথক হলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিদের ভবিষ্যৎ কী হবে, এই প্রশ্ন তুলে অনেকে পরিতোষ পালচৌধুরিকে নিরুৎসাহিত করতে চান। যেন এরা ওই উপত্যকার জন্য দিত রাত চোখের পাতা এক করতে পারেন না।

এই সব প্রশ্ন কারা তোলেন?

না ওই এরা, আমাদের রাজনৈতিক নেতা এবং তস্য সাগরেদের দল।

পরিতোষ পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করেন, আসামের জেলায় জেলায় বাঙালিদের ঘর পুড়লে, বাঙালিদের মেরে কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলে, বাঙালি মেয়েদের মেখলা পরার উপদেশ দিয়ে শাড়ি ধরে টানাটানি করলেও

বিধানসভার এই সব সদস্যরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকেন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় তাণ্ডব চলাকালীন সময়ে কাছাড়ে নৃত্যগীত, নাটক জলসা এসব উৎসব পালনে কোন ঘাটতি দেখা যায় না। এই তো সেদিন মানুষ ছিল তরুণ অপেরা নিয়ে মত্ত। শান্তি গোপালের নেপোলিয়ন, হিটলার ছাড়া আর যেন চর্চার কোন বিষয়ই নেই। পরিতোষ এসব বলতে বলতে রেগে ওঠেন,

'বলি, কবে কোথায় কে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নিগৃহীত বাঙালির পাশে দাঁড়িয়েছেন?'

'সত্যিই তো আমরা তো তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখাইনি'।

'কিন্তু যেই না আমি কাছাড় পৃথকীকরণের জন্য মাঠে নামি। ওরা হায় হায় করেন,--আসাম উপত্যকার বাঙালির কী হবে?

'আপনারাই বলুন তো, আমরা কী করে এদের সুরক্ষা দেব? আমাদের নিজের পায়ের তলায়ই যেখানে মাটি নেই।'

পরিতোষ প্রায়ই আক্ষেপ করে বলেন, 'আমরা কোনও ভাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দুর্গত ভাইবোনের পাশে দাঁড়াতে পারিনি। এ অবস্থায় এসব মায়াকান্না যারা কাঁদেন তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন।'

'আসলে, এই লোকেরা চায় না কাছাড় মেরুদন্ড শক্ত করে দাঁড়াক। আমি বলতে পারি, কাছাড় শক্তিশালী হলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালির বল বাড়বে বই কমবে না।'

তাঁর যুক্তি খুবই সঙ্গত।

কাছাড় থেকে তবুও মাঝে মাঝে বাঁচার তাগিদে বাঙালিদের কিছু দাবি তুলতে হয়-- ভাষার প্রশ্নে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে, স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের দাবিতে, বরাক ডামের দাবিতে। এতে ওঁদিকে উগ্রজাতীয়তাবাদীরা রুষ্ট হন। সামনে পান নিরপরাধ বাঙালিদের, তাদেরই হেনস্তা করেন।

পরিতোষবাবু এক বিবৃতি দিলেন, 'ইউনিয়ন টেরিটোরি ডিমান্ড কমিটি মনে করে কাছাড় আসামে না থাকলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিদের জীবন অনেক সহজ হয়ে যাবে। অসমিয়ারাও পাবেন একটি মনস্তাত্ত্বিক সমাধান।

বাঙালিরা সব খেয়ে ফেলল—ওদের মনে এই ধারণারও অবসান হবে। কিন্তু যতদিন কাছাড় আসামে থাকবে—ততদিন এর পরিবর্তন হবে না।'

পরিতোষ হতাশ হয়ে লক্ষ্য করছেন, কাছাড়ে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব। কেউই বুঝতে পারছেন না কারা এ জেলাটিকে একটি শোষণের কলোনি বানিয়েছে।

সেই প্যাকেজ প্রোগ্রাম থেকে আরম্ভ করে ইএন্ডি বাঁধ, পিডবলিউডি প্রকল্প, বন্যা নিয়ন্ত্রণ সবক্ষেত্রেই রাজধানী আর জেলাভিত্তিক আমলা, কেরানি, ঠিকাদার এবং জনপ্রতিনিধির যোগসাজসে ভুঁয়ো বিল বানানো এবং পাস করিয়ে নেওয়ার ব্যাপার একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে।

মাঝে মাঝে ধুয়া তোলা হয় কাছাড় আলাদা হলে আসাম থেকে সব বাঙালিরা এখানে চলে আসবে। এদের সঙ্গে কাঁহাতক বিতর্ক করা যায়—'হ্যাঁ, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় চাকরিসূত্রে যে সব কাছাড়বাসী আছেন এরা আসতেই পারেন। চাকরি থেকে অবসর নিলে তো আসবেনই। এখানে যে তাঁদের বাড়ি, দেশবাড়ি বলতে তাঁদের এই কাছাড়ই।

পরিতোষ বলেন, 'ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আরেকটি শ্রেণী আছেন, এরা কাছাড়-মূলের কৃষিজীবী—নওগা, বড়পেটা, হোজাই, সরুপাথার, নলবাড়ি, গোয়ালপাড়া— ওইসব অঞ্চলে ক্ষেতকৃষি নিয়ে এরা আছেন, ওদিকে মাটিবাড়ির সংস্থানও করে ফেলেছেন। আর দ্বিতীয় আরেকটি শ্রেণী আছেন- ক্ষুদ্র, মাঝারি ব্যবসায়ী, এবং কিছু চাকুরিজীবীও-- এরা কাছাড়ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দীর্ঘদিন থেকে আসামবাসী। ভাষার আড়ষ্টতা কাটাতে না পারলেও মনের দিকে ওই উপত্যকাকে গ্রহণ করে ফেলেছেন-- এরা কদাপিও কাছাড়ে আসবেন না।

এই শ্রেণী সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এরা সর্বাবস্থায়ই আসামের মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। এমনকী জীবনসংশয় হলেও না।' শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্বন্ধে পরিতোষের মন্তব্য অনেকের পছন্দ না হলেও একেবারে মিথ্যাও নয়।

'এই শ্রেণী প্রয়োজনে সেন থেকে সেনডেকা লিখবে। ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, চৌধুরী, শর্মা এমনকী দত্ত উপাধিধারীরা তো অসমিয়া সমাজের সঙ্গে মিশে

গেছেন। অত্যাচার সহ্য করেও, আত্মপরিচয়ের সমস্যায় পীড়িত হলেও এরা এই দ্বিতীয় মাতৃভূমি ছাড়বেন না। এই যে এত দাঙ্গা, গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ। এদের ঘর পুড়েছে, এরা কাতারে কাতারে প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু বলুন তো, এদের ক'জন শরনার্থী হয়ে কাছাড়ে এসেছেন? কতটা রিলিফ ক্যাম্প খোলা হয়েছে এ জেলায়?'

পরিতোষবাবুর গবেষণা এবং যুক্তি অকাট্য-- 'রেল, বীমা, ডাক বিভাগ ইত্যাদি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করছেন, এদের আশি শতাংশ নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা ইত্যাদি জেলার লোক। পারিবারিক এবং সাংস্কৃতিক দিকে এইসব লোক উত্তরবঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বেশি নৈকট্য বোধ করেন। কাছাড়ের সঙ্গে এদের ক'জনাই আর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন? এই সব চাকুরিজীবী মানুষ অবশ্যই অবসর গ্রহণের পর কাছাড়ে স্থায়ী বাড়িঘর করবেন না, কোনদিন করেনই নি।'

কাছাড়কে ইউনিয়ন টেরিটোরি বানানোর দাবি নিয়ে ১৯৭২ সালের ২৮ নভেম্বর প্রবাদপ্রতীম আইনজীবী ও জননেতা কামিনীকুমার চন্দের সন্তান, ভারতের ফিনান্স কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোককুমার চন্দের নেতৃত্বে ডিমান্ড কমিটি দিল্লি দরবারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হাতে স্মারকলিপি তুলে দিলে তিনি জিজ্ঞেস করেন—উইল ইট সলভ ইয়োর প্রবলেম? তাঁদের সরাসরি উত্তর ছিল, 'ইয়েস, ম্যাডাম! মোর অভার, থিস উইল ব্রিং আ সাইকোলজিক্যাল সলিউশন ফর দ্যা এসামিজ'। ডিমান্ড কমিটির সভাপতি শ্রী চন্দ ছাড়া সেদিন উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক পরিতোষ পালচৌধুরি, তারাশঙ্কর পুরকায়স্থ, সুধীরকুমার রায় আর তাজউদ্দিন বড়ভুঁইয়া।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ওঁরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীযুক্ত কে সি পন্থের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে, মন্ত্রী মহোদয়ও সেই পুরনো প্রশ্নই তুললেন যেমন তাঁকে কংগ্রেসি বিরাদরিরা শুনিয়েছেন, 'কাছাড় আলাদা হলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিদের কী হবে?' যেন ওই বাঙালিদের রক্ষা করার দায়িত্ব কাছাড়ের। অবশ্য ডিমান্ড কমিটি একমিনিটও সময় নষ্ট না করে বললেন, 'আমরা কথা বলছি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে। বলি, রাজ্যের একটা বিশেষ উপত্যকার নিরাপত্তার দায়িত্ব কি কাছাড়বাসীর, না কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের?' এরা মন্ত্রীকে পালটা প্রশ্ন

করলেন, 'আমরা কি জানতে পারি, দিল্লিতে বসবাসকারী বাঙালিদের নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকারের না কোনও বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ ভাষিকগোষ্ঠীর?' পরিতোষটিম একেবারে প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলেন। সজেই ওঁরা স্বরাষ্ট্রসচিবেরও আরও কয়েকটি জটিল প্রশ্নের মোকাবিলা করতেও সক্ষম হলেন। বিব্রত মন্ত্রীমহোদয় এতে খুব একটা যে অসন্তুষ্ট হয়েছেন তাও নয়, তিনি খুশি হয়েই বলে দিলেন, 'ডন'ট ওয়ারি, হ্যাভ পেশেন্স। থোড়া ঠেরো, কর দেয়গা সেপারেট'।

বিষয়টি প্রেমেন্দ্রবাবুকেও উৎসাহিত করেছিল, যদিও তাঁর কর্মক্ষেত্র আলাদা। কিন্তু তাঁর আশঙ্কা, এত সহজে কি রাজ্য সরকার কাছাড়ের উপর কর্তৃত্ব ছেড়ে দেবে, বিশেষ করে যখন কাছাড়ে ওঁরা বেশ কিছু সংখ্যক অনুগামী পেয়ে গেছে এবং দিনে দুপুরে অবাধ লুণ্ঠনের সুযোগ আরও দৃঢ় করে ফেলেছে? পরিতোষ পালচৌধুরি চাইছিলেন যেখান থেকে ইতিপূর্বে কাছাড় পৃথকীকরণের বিরোধিতা হয়েছিল সেখান থেকেই পৃথকীকরণের আওয়াজ উঠুক। প্রায় দেড় দশক আগে গঠিত 'কাছাড় জনকল্যান পরিষদে'র বিপরীতে এবার 'কাছাড় জনমঙ্গল পরিষদে'র পক্ষ থেকে কাছাড় জেলাকে অনতিবিলম্বে একটি কেন্দ্রীয়শাসিত রাজ্য হিসাবে ঘোষণার দাবি জানানো হল। এর পেছনে অবশ্যই পরিতোষবাবুর প্রয়াস ছিল। এ মর্মে প্রেরিত স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করলেন হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, যতীন্দ্রমোহন দেবলস্কর, রুদ্রপ্রসাদ নাথ মজুমদার, মহেন্দ্রমোহন সিংহচৌধুরি, ডা. সুরেন্দ্রকুমার দাস, সুলতান আলি মজুমদার, পূর্ণচন্দ্র সরকার, কৃষ্ণমোহন দাস প্রমুখ।

কে সি পন্থ ইউনিয়ন টেরিটোরি ডিমান্ড কমিটিকে কয়েকটি মাস অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে আসামে অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেল। প্রেমেন্দ্রমোহনের সমস্ত মনোযোগ এখন এদিকে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তখন শরৎচন্দ্র সিনহা। কাছাড়ে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় ভাষা আন্দোলন। ঘটনার সূচনা হয় বাহাত্তর সালের পনেরো মে তারিখে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আসামের কলেজগুলোতে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে মাধ্যম হিসেবে অসমিয়া ভাষা চালু করার প্রস্তাব (সার্কুলার-নং ৪, ১৯৭২) জারি হওয়ায়। ২৭ মে মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিনহা মহোদয় রামকৃষ্ণনগরে কাছাড় কংগ্রেস

ওয়ার্কিং কমিটির সমাবর্তনে এসে আশ্বাস দিলেন বাঙালিদের আবেদনের প্রতি নজর দেওয়া হবে ইত্যাদি। কিন্তু ১২ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হল 'ইংলিশ শ্যাল কনটিনিউ এজ অল্টারনেটিভ মিডিয়াম নট এক্সিডিং টেন ইয়ার্স।' এবং 'স্টুডেন্টস শ্যাল হ্যাব দ্যা অপশন টু আনসার ইদার ইন এসামিজ অর ইংলিশ।' বাংলার কোন সংস্থান নেই, এ অবস্থায় আবার ২৩ সেপ্টেম্বর কাছাড়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব এল, প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল এবং এর অব্যবহিত পরেই প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে আবার নাকচও হয়ে গেল।

এতসব কাণ্ড কারখানার মাঝে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে শুরু হল জাতিদাঙ্গা, প্রাণ গেল অসংখ্য বাঙালির, গৃহদাহ, সম্পত্তি নষ্ট এসব তো ছিলই, পুলিশের গুলিতে প্রাণ গেল একাধিক ব্যক্তির। এ পুরো পর্বে অবশ্য মহীতোষবাবু বিধান সভার ভেতর এবং বাইরে সরব। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, সুদর্শন দাস, আব্দুর রহমান চৌধুরিও ছিলেন তাঁর সঙ্গে। সব চাইতে সরব সমর্থক ছিলেন মৌলানা আব্দুল জলিল। এদের সঙ্গে পরামর্শ করে মহীতোষবাবু সিদ্ধান্ত নিলেন, আসামের বিষয়টি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নজরে আনবেন।

এর একমাস সাতদিন পর ৪ জানুয়ারি, ১৯৭৩ মহীতোষ পুরকায়স্থের নেতৃত্বে কাছাড়ের কংগ্রেস এমএলএ এবং এমপিদের ১৭ জনের একটি প্রতিনিধি দল দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকে বসলেন। কিন্তু হায় কাছাড়ের ভবিষ্যৎকে একেবারে অনিশ্চিতির মধ্যে রেখে একেবারে শূন্য হাতে এরা ফিরে এলেন। কেসি পন্থ তো ইতিপূর্বে বলেইছিলেন আলাদা করে দেবেন। কিন্তু আজ এরা যে একবাক্যে বলে দিলেন 'সেপারেশ ইজ নো সলিউশন'। অসমিয়া লবির বিরুদ্ধে গিয়ে আসামে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলাভাষার দাবি প্রসঙ্গে পন্থজি রাখ ঢাক না করেই বলে দিলেন, 'দেখিয়ে জি আসামমে বাংলা নেহি হোগা, আউর কুছ মাঙ্গিয়ে'।

তাঁকে কি আর দোষ দেওয়া যায়? তিনি তো কাছাড়কে আলাদা করে দিয়ে আসাম সমস্যার স্থায়ী সমাধানই চেয়েছিলেন।

বৈঠকে ইন্দিরা গান্ধী, কে সি পন্থের পাশে ময়ীনুল হক চৌধুরীও ছিলেন। কী বিভ্রান্তিতে পড়ে কংগ্রেসিরা প্রস্তাবটি নাকচ করলেন কে জানে? অবশ্য এখানেও একটা সাম্প্রদায়িক ভাবনাও অন্তর্লীন ছিল। আলাদা হলে ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে এদের মধ্যেও স্পষ্টতার অভাব ছিল।

কাছাড় সেপারেশনের একজন জোরালো দাবিদার মৌলানা আব্দুল জলিল সাহেব এসব দেখে পূর্বাপর চুপ করে বসে রইলেন। মহীতোষবাবুর বোধহয় সম্বিত ফিরে এসেছে সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার পর। এখন তো যখন সব শেষ। বিমূঢ় মহীতোষবাবু তাঁকে বললেন, 'কিতা রে বা মৌলানা, তুমি তো মুখ খুললায়ই না'। জলিল সাহেব রাগে দুঃখে বললেন, 'অয়রেবা আমি একলা চাইতাম সেপারেশন, আর তুমরা কইতায় ভাসানির চর।'

কাছাড়ের ভাগ্যে আরও অবমাননা ছিল। গৌহাটিতে অপরাপর দলীয় সহকর্মীরাই মহীতোষবাবুর বিরুদ্ধে বিধান সভায় সোচ্চার হতে থাকেন, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা গ্রহণ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। তাঁর হাত থেকে খাদ্য ও অসামরিক সরবাহ, আবগারি বিভাগের দায়িত্ব কেঁড়ে নিয়ে তাঁকে বানানো হল দপ্তরবিহীন মন্ত্রী। আসাম ট্রিব্যুন পত্রিকায় ২৩ মার্চ, ১৯৭৩ সংবাদ বেরোল, 'কলকাতা বিমানবন্দরে মহীতোষ পুরকায়স্থ সাংবাদিকদের কাছে বিবৃতি দিলেন তিনি দিল্লিতে কেসি পন্থ এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে আসামের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা তুলে ধরবেন।' এ সংবাদের সূত্র ধরে দুলালচন্দ্র বরুয়া বিধান সভা সরগম করে তুললেন। মহীতোষবাবু নাকি বলছেন আসামে বাংলা সংবাদপত্র, বাংলা সিনেমা নিষিদ্ধ। এমনকী নওগায় কলেজ ছাত্রীদের শাড়ি ছেড়ে মেখলা না পরলে ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলে তিনি নাকি অহেতুক উত্তেজনা সৃষ্টি করছেন এ অভিযোগও তুললেন। শ্রীমতী রেণুকাদেবী বরকটকী তো সদনকে গরম করে তুললেন, 'মহিতোষবাবু পাগল হয়ে গেছেন। তিনি জনসমক্ষে বিবৃতি দিচ্ছেন মেয়েদের শাড়ি পরতে দেওয়া হচ্ছে না, অথচ একজন অসমিয়া নারী হয়ে শাড়ি পরি, আজও পরেছি। বিগত দিনের গণ্ডগোলের সময়ও সারা রাজ্যে আমি শাড়ি পরে ঘুরেছি, এ জন্য কোন অসমিয়া যুবক তো আমাকে হেনস্তা করেনি।'

অবশ্য কাছাড়ের সদস্যরা এই 'বিগত দিনের গণ্ডগোল' নিয়ে একটি কথাও বলার প্রয়োজন মনে করলেন না। কয়েক মাস পরে কলকাতার দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় পর পর দুইদিন শিরোনামে এল আসাম। কাছাড়ের কংগ্রেসি নেতারা মুখ বুজে হজম করলেন- 'পুরকায়স্থকে পরিষদীয় ভর্ৎসনা' (১৫ ফেব্রুয়ারি এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪)। ভর্ৎসনা-বাক্যটি উচ্চারণ করলেন স্পিকার শ্রী রমেশচন্দ্র বরুয়া -'স্পিকার হিসেবে সভার নির্দেশ অনুসারে সভার অধিকার ভঙ্গের জন্য ভর্ৎসনা করছি।' পিটিআই-ইউএন আই সূত্রে এ ঘটনার সংবাদ আরও জানিয়েছে--

> ভর্ৎসনার আগে শ্রী পুরকায়স্থ এক বিবৃতিতে জানান যে ভাষাগত ও ধর্মীয় নীতির ব্যাপারে মন্ত্রীসভার সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটায় তিনি ২৬ জানুয়ারি মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন।... তিনি বলেন ১৯৬১ সালের শাস্ত্রীফর্মুলা অনুসারে কলেজ লেভেলে বাংলা ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা করতে সরকারকে বলা হয়েছে। ... তিনি আরও বলেন, যতদূর মনে করি এটা আমার এবং এমনকী মন্ত্রীসভার একজন সদস্য হওয়া সত্ত্বেও প্রধান কর্তব্য (বলা) যে শাস্ত্রীফর্মুলা সরকার মেনে নিতে বাধ্য এবং এই সত্যের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা আমার প্রধান কর্তব্য। শ্রী পুরকায়স্থ সবার সামনে বলেন, এটা সবিনয়ে জানাচ্ছি যে আমি ভাষিক সংখ্যালঘুদের ভাষা ও সংস্কৃতির পূর্ণ স্বীকৃতি আদায়ের জন্য আজীবন কাজ করে যাব।

মহীতোষবাবুর শেষ কথাগুলো দিন কতক খুব চর্চিত হল, তবে সদনে নয় বাইরে। নিঃসঙ্গ এ নেতার উক্তি ছিল--'কারো প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। সকলের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে এই প্রার্থনা জানাই যেন রাজ্যে অশুভ শক্তি ও ভয় দূর হয়, যেন সকলের হৃদয়ের পরিবর্তন হয়।'

পড়ন্ত বিকেলে বিধানসভা থেকে বেরিয়ে একাকী ধীর পদক্ষেপে মহীতোষবাবু এগিয়ে চললেন হোস্টেলের দিকে। হঠাৎ থমকে গিয়ে দেখেন তাঁরা সামনেই গাছ থেকে একটা পাতা দুলতে দুলতে মাটিতে পড়ে হাওয়ার টানে কড় কড় শব্দে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। ছিন্নপত্রের এ আর্তনাদ তাঁকে

ক্ষণেকের জন্য উন্মনা করে তুললেও তিনি নিজেকে স্থির করে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন।

১২

একজন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, শ্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এক দশক আগে কাছাড়কে ত্রিভাষা সূত্র দিয়ে একটা ভাষিক সুরক্ষা দিয়েছেন, আর এবার আরেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র পন্থজির অভিপ্রায় কী এটা কাছাড়ের কংগ্রেসি নেতারা বুঝতে পারলেন না। ইউনিয়ন টেরিটোরি ডিমান্ড কমিটিকে তো বলেছিলেন অপেক্ষা করতেঃ থোরা ঠেরো, সেপারেট কর দেঙ্গা। তিনি অবশ্য ১৯৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল শিলং বৈঠকে বরাক উপত্যকার ভাষার দাবিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেও সেপারেশন প্রস্তাবে অনড় ছিলেন। এবার অবশ্য মহীতোষবাবু সহ কাছাড়ের কংগ্রেসি এবং অকংগ্রেসি নেতারা পন্থচুক্তিতে স্বাক্ষর করে এলেন। কাজের কাজ কিছুই হল না। বাংলা ভাষার দাবি রইল পেছনে পড়ে। এই একই কথা তিনি আবার দিল্লি বৈঠকে সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'আসাম মে বাংলা নেহি হোগা'। তবে সেপারেশন চাইলে সব পাবে-- শিল্প, বাণিজ্য, বরাক ডাম এবং অবশ্যই বাংলা ভাষা। আসামকে যে ওঁরা একভাষী রাজ্য হিসেবেই গড়ে তুলতে চাইছে এতে তিনি বোধহয় বাধ সাধতে চাইছেন না। এতে যদি রাজ্যিটি আরও সঙ্কুচিত হয়ে যাক ক্ষতি নেই।

আজকের দিন হলে সেপারেশন ন্যারেটিভ নিয়ে অনেক তত্ত্ব খাড়া হত। তখন তো এসব পরিভাষা আসে নি, আর কাছাড়ের রাজনীতি নিয়ে কোন ধরনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ধারণাই সৃষ্টি হয়নি। কিছু দিন পর অবশ্য মহীতোষবাবু 'এনাটমি অব নর্থ ইস্ট' শিরোনামে একটি পুস্তিকা লিখে ফেললেন। কিন্তু কাছাড়ের রাজনৈতিক জগতে এসবের গুরুত্ব উপলব্ধি করার যে কেউই নেই। যে ক'জন মেধাবী ব্যক্তি এদিকে পা বাড়াতে ইচ্ছুক এদের দাবিয়ে রাখবার সমস্ত কলা কৌশল নিয়ে মধ্যমেধা বা মেধাশূন্যরা উদ্বাহু নৃত্য করছেন। এ চরম হতাশার মুখে একষষ্টির ডিক্টেটর পরিতোষ পালচৌধুরি একাকীই তাঁর কাজ চালিয়ে গেলেন। কাছাড়ের আশা নিরাশা, বঞ্চনা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিবরণ নিয়ে তিনি নিজেই একখানি পুস্তক লিখে প্রধামন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিলেন। বইটির নাম 'কাছাড়ের কান্না'। তাঁর হতাশা

কাছাড়ে নেতৃত্ব বলতে তো কিছু নেই। ডান বাম সব ক্ষেত্রই নৈরাশ্য। পাছে প্রাদেশিক কমিটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, এই ভয়ে কাছাড় জেলার জন্য কোন আন্দোলনের কার্যসূচি হাতে নিতে সাহস পান না বামপন্থীরা। আর কংগ্রেসিরা? এরা গণআন্দোলনের চাপে পড়ে একদিন বিধান সভার সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন সত্যি। কিন্তু এমনিতে কাছাড়ের জন্য সদনে কদাচিৎই মুখ খোলেন। কাছাড়ের উন্নয়নের জন্য চিন্তা করবেন, পেটে সেই বিদ্যা থাকলে তো। এরা শিক্ষা, সমাজ, শিল্প, অর্থনীতির ভাবনা ছাড়া যে ভাবনায় সতত বিব্রত থাকেন, তা হল আগামী নির্বাচলে নমিনেশন পাবেন তো? রাজ্যস্তরের নেতাদের ভয়ে এরা সব সময় মুষড়ে থাকেন। এ জন্য মাতৃভাষার জন্য চরম বেইমানিও করতে প্রস্তুত।

এরই মধ্যে প্রান্ত্যজ্যোতি, অরুণোদয়, জনশক্তি, শপথ, আজাদ এবং করিমগঞ্জের যুগশক্তি পত্রিকা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার প্রসার সে রকম না হওয়াতে এখনও গণমাধ্যমের দ্বারা সাধারণ মানুষের প্রভাবিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অথচ যেসব সমস্যা জন জীবনকে পীড়িত করছে এর সঙ্গে তো শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি এসবই নিবিড় ভাবে জড়িত। রাজ্যভাষা, মাতৃভাষার অধিকার এসব বিষয় সাধারণ চাষবাস করা মানুষ, দোকানদার, সাধারণ চাকুরিজীবী মানুষ কতটুকুই বা বুঝবে? সেই যে গ্রামের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিতরা ‘আসামি ভাষা আমরা চাই’ বলে পথে বেরিয়ে গেল, কিংবা হাইলাকান্দিতে দাঙ্গা বাঁধিয়ে বেঘোরে প্রাণ দিল এরা তো কিছুই বুঝতে পারে নি, কেন এ সংগ্রাম, কেনই এ মিছিল। সামান্য দু পাঁচ টাকা বকশিসের বিনেময়ে এদের অসমিয়া ভাষাপ্রীতি। সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহও কাছাড়ে সাধারণ জনজীবনে তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। তবুও বিক্ষিপ্তভাবে সংগ্রাম শুরু হল। শুরু হল সরকারি দমন পীড়নও।

আন্দোলনে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে ছাত্রদলের পদযাত্রা করে সংগ্রামের বার্তা গ্রামেগঞ্জে পৌঁছে দিতে প্রয়াস দেখা গেল। রাজনৈতিক নেতাদের উপর আস্থা হারিয়ে স্কুল শিক্ষকরা সংগ্রামের পথে পা বাড়ালেন। সময়টি যে তাঁদের পক্ষে খুব অনুকূল ছিল তা তো নয়। শিক্ষক সংস্থাগুলোর সরকারি স্বীকৃতিও ছিল না। রাজ্যস্তরের নেতৃবর্গের চিন্তাধারার সঙ্গে জেলাস্তরের নেতাদের চিন্তার বিস্তর

ফারাক। একদল ভাষা সম্প্রসারণবাদীর সমর্থক, আর কাছাড়ের জেলা সমিতির অবস্থান এরই বিপরীতে। তবু এরাই বিপদের ঝুঁকি নিয়েই রাজ্য সরকারের ভাষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হলেন। ১৯৭২ সালের ৩০ ডিসেম্বরের নির্দেশনামায় অন-অসমিয়াছাত্র ছাত্রীদের অসমিয়া ভাষাকে অবশ্যপাঠ্য তৃতীয়ভাষা হিসেবে যে নিদান দেওয়া হল, কাছাড়ের তিনটি মহকুমায় সর্বস্তরের শিক্ষক সমাজ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হলেন। এ বিশাল আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গঠিত হল 'শিক্ষক সমন্বয় সমিতি' এতে পাঠশালা, মধ্যবঙ্গ থেকে হাইস্কুল, হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের সঙ্গে সামিল হলেন কাছাড়ের সব ক'টি মাদ্রাসার শিক্ষকরাও। বাঁশকান্দির ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আহমেদ আলিও এ আন্দোলনে জোগালেন অনুপ্রেরণা।

পুরো ১৯৭২ সালটাই কাছাড়ের সামনে এক প্রত্যাহ্বান। জুন মাসে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিলেন, (ক) এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলোতে শিক্ষার মাধ্যম হবে অসমিয়া। (খ) একাডেমিক কাউন্সিল যতদিন না কোন কোন সিদ্ধান্ত না নিচ্ছে ততদিন ইংরেজি বহাল থাকবে। তবে এটা দশ বছরের জন্যই। আর ডিসেম্বরের ৩০ তারিখ এল সেবা সার্কুলার, সঙ্গে হাইস্কুলের নতুন কারিকুলাম। প্রতিরোধ এল শিক্ষক সংগঠন থেকে। স্কুল শিক্ষক এবং কর্মচারি পরিষদ, সে সঙ্গে সমন্বয় সমিতির সত্যাগ্রহীদের ধরে ধরে জেলে পাঠানো হল এবং এতে আন্দোলন আরও তীব্র মাত্রা ধারণ করল। বাধ্য হয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে, সি পন্থ একটি বিবৃতি দিয়ে জানালেন যে সেবা সার্কুলারে অনিচ্ছাককৃত ভাবে কিছু ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকাতে এটাকে সামান্য পরিবর্তন করা হচ্ছে—বলা হল সেবা সার্কুলার..."ইজ বিয়িং স্যুটেবলি রিভাইজড"। সেবা অবশ্য এতে কর্ণপাতও করেনি।

বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসন ও রিলিফ, ক্রনিকল পত্রিকা সম্পাদনা, মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, গ্রামেগঞ্জে সাহিত্যচর্চার প্রসার কর্মসূচি নিয়ে সতত ব্যস্ত অধ্যক্ষ প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামী এবার এই আন্দোলনেও অগ্রণী সেনাপতি। শিক্ষক সমন্বয় সমিতির পক্ষে দিলেন মহা অভিবর্তনের ডাক। সূচনাতে অনেকেই এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। অনুজ শিক্ষকরা এক বাক্যে জানিয়ে দিলেন,

এতে কোন রাজনৈতিক নেতাকে ডাকা চলবে না। এদের উপর মানুষ একেবারে বীতশ্রদ্ধ। এ দিকে মহীতোষ পুরকায়স্থ যে নিজেই এ অভিবর্তনের প্রস্তুতি পর্বে কাজে নেমেছেন। আর প্রেমেন্দ্রবাবু যে মহামান্য মন্ত্রী ময়ীনুল হক চৌধুরিকে নিমন্ত্রণও দিয়ে ফেলেছেন। প্রস্তুতিসভায় এ নিয়ে তুমুল উত্তেজনা। কেউই প্রেমেন্দ্রবাবুকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না। মহীতোষবাবু অবশ্য তাঁদের এ সিদ্ধান্তকে স্বাগতই জানালেন।

কিন্তু মন্ত্রীর নিমন্ত্রণের কী হবে? প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামী অবিচল। তাঁর কাছে সংগঠন বড়, ব্যক্তিগত মান অপমান, ইচ্ছা অনিচ্ছার চাইতে সমষ্ঠিগত ইচ্ছার দামই বেশি। প্রাথমিক ভাবে একটি ধাক্কা খেলেও তিনি নিজেই নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে নিতে স্বয়ং মন্ত্রী মহোদয়ের ওখানে হাজির। বাঘা মন্ত্রী ময়ীনুল হক সাহেব এ সুযোগে অধ্যক্ষ মহোদয়কে বেশ কিছু কড়া কথাও শুনিয়ে দিলেন। স্পষ্টবাদী এ ব্যক্তির কাজকর্ম তিনি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করছিলেন, আজ এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিলেন।

শিলচর থেকে বেরোচ্ছে একপাতার পত্রিকা, 'শপথ'। এতে কাকেশ্বর কুচকুচে নাম দিয়ে খ্যাতিমান ব্যারিস্টার সাহেব লিখে দিলেন ব্যঙ্গরচনা, 'বরৈ ভর্তা'। তাঁর বাড়ির সান্ধ্য মজলিশে শহরের কবি সাহিত্যিক শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ হয়, এ নিয়ে হাসাহাসি হলেও এতে কেউ খুব ক্ষুন্নও হলেন না অবশ্য। তবে রাজনৈতিক নেতাদের নিন্দা উপেক্ষা করেই পুরো জেলা জুড়ে গণ অভিবর্তনের ডাক সাড়া ফেলে দিল। পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ শ্রী ত্রিদিবকুমার চৌধুরীর পৌরোহিত্যে শিলচরে অনুষ্ঠিত হল শিক্ষক-অভিভাবক অভিবর্তন। তারিখটি ছিল ১৯৭৫ সালের ১৯মে। সভাকক্ষে গিজ গিজ করছেন পাঠশালা, এমই, হাইস্কুলের মাস্টারমশাইরা, টুপি পরে ঢুকলেন দলে দলে মাদ্রাসার শিক্ষক, এলেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, পৌরসভা, পঞ্চায়েত সদস্যরাও। আমন্ত্রিত হয়ে শ্রোতা হিসেব যোগদান করলেন বিধায়ক ও সাংসদও। প্রকাশ্য অধিবেশনে গঠিত হল 'শিক্ষাসংরক্ষণ সমিতি'। বিপুল গণসমর্থনে করিমগঞ্জের নলিনীকান্ত দাস সভাপতি এবং প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামী সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। প্রেমেন্দ্রমোহনের সংগ্রামী জীবনে শুরু হল আরেকটি পর্ব।

১৩

বাহাত্তরে একবার বেসরকারী তরফে কাছাড়ের জন্য একটি রাজ্যস্তরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব এসে আবার নাকচ হয়ে গেল। প্রেমেন্দ্রবাবু এবং তাঁর সঙ্গীরাও বলছেন, এ বিশ্ববিদ্যালয় না হওয়া কোন খারাপ কিছু নয়। আমরা চাই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এর জন্য যে প্রবল জনমত এবং আন্দোলনের প্রয়োজন এদিকে কি কারো নজর আছে? আন্দোলন ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় আসবে না, এটা সবাই জানেন। কিন্তু কে বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে? কলেজ শিক্ষকদের কাছে খুব একটা আশা করে লাভ নেই, আর স্কুল টিচারদের সীমাবদ্ধতা নিয়ে কিছু বলার নেই। তবুও এরা যা দেখিয়েছেন, কাছাড়ের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এ সব কথা শুনলে অবশ্য প্রেমেনবাবু আজকাল খেপে যানঃ 'ইতিহাসে নাম লেখানোর জন্য কাজ করার দরকার নেই। স্বাধীনতার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন এরাও এই অমরত্বের প্রত্যাশা করে আন্দোলনে নামেন নি। এ সব উচ্চাশা বরং রাজনৈতিক নেতাদের জন্য জমা থাকুক। কী বলেন মহীতোষবাবু?' এসব শুনে মহীতোষবাবু হাসেন। প্রেমেন্দ্রবাবু বলেন, 'কোন বৃহৎ কিছু করতে গেলে চিন্তার ক্ষেত্রটি প্রসারিত করতে হয়।' দেবব্রতবাবু সংযোজন করেন, "রোমান দার্শনিক মার্কাস অরোলিয়াস বলেছিলেন 'প্রতিটি মহৎ কর্মের পেছনে থাকে একটা মহৎ চিন্তা। আমাদের উচ্চশিক্ষার দরজাটা আরও উন্মুক্ত হওয়া উচিত। সেই চল্লিশ বছর আগে শহরের বাইরে, নদীর ওপার এক সাহেবের পরিত্যক্ত বাংলোতে যে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হল, এ কলেজটিকে কেন্দ্রকরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না হয় বাদই দিলাম, একটি পি, জি সেন্টার করার স্বপ্ন আমরা দেখলাম না এতদিন।"

আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন এস আই রাঘবেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। তিনি বললেন, 'দেখুন এর আগে ছিল নর্মাল স্কুল। এ অঞ্চলের শিক্ষাজগতের পুরোধা প্রতিষ্ঠান। অঘোরনাথ অধিকারী, জগন্নাথ দেব, ভুবন্মোহন বিদ্যার্ণব, আব্দুল বারি এরা অঞ্চলটির মনোজগৎটি গড়ে দিয়েছিলেন। এর চাইতে বড়ো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ গুরুচরণ কলেজের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রত্যাশা আরো বেড়ে গেল। অরুণকুমার চন্দ মশাইয়ের নেতৃত্বে যে সব শিক্ষাবিদের সমাবেশ ঘটেছিল এই কলেজে এতেই কাছাড় জেলার মনো

জগতের বিস্তার সম্ভবপর হয়েছিল।' এ প্রসঙ্গটি আবার উত্থিত হল আরেক দিন। এদিনের আসরে উপস্থিত জ্যোতির্ময় সেন, পুষ্পরঞ্জন গুপ্ত এবং স্কুল ইন্সপেক্টর নগেন্দ্রচন্দ্র শর্মা মশাই। আসরের মধ্যমণি দেবব্রতবাবু নগেন শর্মা মশাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমাদের এ জেলার এক স্কুল আধিকারিক, অর্থাৎ আপনাদেরই পুর্বসূরি-- ছিলেন উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ। তিনি স্কুল পর্যবেক্ষণ করার ফাঁকে ফাকেঁ এ অঞ্চলের ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব সন্ধানও করতেন। এ শতাব্দীর প্রথম দশকে রচনা করেছিলেন 'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত'।" তুখড় পড়ুয়া নগেন শর্মা বললেন 'বইটি কি জেলা গ্রন্থাগারে আছে? আমি তো সপ্তায় একদিন ওখানে যাই।'

জ্যোতির্ময় বাবু বললেন, "না না ওসব বই এরা রাখেন না। বিগত ক'টি বছর ধরে কোন ভাল বইই আসছে না। এই তো দেবব্রতবাবুর 'ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডস' বইটিই খুঁজে পেলাম না।"

পকেট থেকে নোটবই বের করে ইন্সপেক্টর মশাই দুটো বইয়ের নাম লিখে নিলেন, 'কারা প্রকাশ করেছেন বইগুলো?' মহীতোষবাবুই বললেন, "চন্দ্রপ্রসাদ সইকিয়া আসাম প্রকাশন পর্ষদের পক্ষ থেকে বছর তিনচার হবে 'ইতিবৃত্ত' বের করেছেন।"

দেবব্রতবাবু বলে উঠলেন, "এইটা কিন্তু মূল বইয়ের অনুরূপ নয়, এখানে ওখানে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। আমার কাছে 'সরস্বতী প্রেস' ঢাকা, থেকে প্রকাশিত পাঁচ সিকা দামের বইটি আছে। আসলে এ ধরনের বই পুনঃপ্রকাশ করতে হলে সেটা সম্পাদিত সংস্করণই হতে হয়। নবসংস্করণ বলা হয়, অথচ এতে কোন সংস্কার করা হয় না, তা কি করে হয়? ইংল্যন্ডের ক্লাসিক বইগুলো দেখবেন যখন যখনই reprint হয় তখনই প্রকাশক খুঁজে নেন একজন সুযোগ্য সম্পাদক। আরে, ম্যাক মিলান কোম্পানি যখন রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির দ্বিতীয় সংস্করণ বের করেন তখন এক বাঘা সাহিত্য সমালোচককে সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়ে বিপদে পড়েছিলেন। সম্পাদক মশাই তো রবীন্দ্রনাথের গ্র্যামার কারেকশন করতে বসে গেলেন। এদিকে কবিগুরুও কম যান না, তিনি পত্রপাঠ সংশোধনী প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন, প্রয়োজন নেই বই ছাপিয়ে। সে আরেক সাতকাহন।"

নগেনবাবু কৌতূহল নিবৃত্তি করতে জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই সম্পাদক কি ডবলিউ বি ইয়েটস?'

'না না, ইনি আরো একজন ব্যক্তি।'

হাফ ছেড়ে বাঁচলেন ইন্সপেক্টর মশাই, ইয়েটসের প্রতি তাঁর একটু দুর্বলতা। তাঁর বিশ্বাস, এই কবির ভূমিকা পড়েই ইউরোপ কবিগুরুকে আবিষ্কার করেছে।

কথা হচ্ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে। এরা সবাই বিশ্বাস করেন কাছাড়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আশু প্রয়োজন। নইলে অঞ্চলটির বৌদ্ধিক জগৎ অচলায়তনের আবর্তে পড়ে যাবে। মৌলিক গবেষণা, বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রকল্প এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রবে না এলে সম্ভব নয়। শিলচর আর গৌহাটির মধ্যিখানে বড়াইল পাহাড়ের উচ্চ প্রাচীর ডিঙিয়ে রাজ্যের মূলভূমির বিদ্যাচর্চার সঙ্গে সমতা রক্ষা করা সহজ ব্যাপার নয়। এসব না হলে কলেজ শিক্ষক সমাজ তো কেবল রাজনীতি করবে, ইউনিয়ন নিয়ে দলাদলি করবে, ব্যবসা বাণিজ্যও করবে। ব্যবসা বাণিজ্য? 'হ্যাঁ, নোটবই লেখা, আর প্রাইভেট টিউশন-- এ বাণিজ্যে এরা বেশ এগিয়ে আছেন' বলে দম নিলেন নগেন শর্মা। তিনি একাধিক কলেজের গভর্নিং বডিরও সদস্য।

আরেকদিন কথা উঠল কলেজগুলোর অচলাবস্থা নিয়ে। মহীতোষবাবুর দল চাইলে কাছাড়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এত দিনে হয়েই যেত। মানুষ তো সব সময়েই এগিয়ে যায়। এই এগিয়ে যাওয়া প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হলেই সমস্যা।

'এই যে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, এর প্রতিষ্ঠাতেও যথেষ্টর চাইতেও বেশি বিলম্ব হয়েছে', বললেন সীতাংশু দত্তমজুমদার। শিলচরে সবাই ভোলা মজুমদার বলে এক ডাকে চিনে। সেকালের সুরমা উপত্যকার ডি আই মনমোহন দত্তমজুমদারের সন্তান। দেবব্রতবাবু ওকে বলেন, 'ভোলা সাহেব'। ইনি কদাচিৎ এরকম আসরে আসেন, তবে এলে আসর জমিয়ে কথা বলেন। শিক্ষা বিভাগে নানা পদে, নানা স্থানে কাজ করে তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ। পোশাকেআশাকে কথাবার্তায় সবকিছুতেই একেবারে সাহেবি চাল চলন, তবে খুব অমায়িক জেন্টলম্যান।

'এই যে ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটি, এটাও একটু দেরিতেই প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমি নিজেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গড়ে ওঠার পর্বে জড়িত ছিলাম, দেখেছি, ওয়ানস স্টার্টেড ইট মোভড এট আ র‍্যাপিড স্ট্রাইড'।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ প্রসঙ্গ টেনে দেবব্রতবাবু বললেন, 'অরুণ চন্দ মশাই যথাসময়ে উদ্যোগ না নিলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্য সিকেয় ঝুলত আরো কত দিন কে জানে। সিলেটের জনপ্রতিনিধিরা গোড়া থেকেই বাগড়া দিয়ে আসছিলেন। এই যে বলে 'ভ্যালি ইজম' মানে দুই উপত্যকা দ্বন্দ্ব এটা চরম আকার ধারণ করেছিল।' এই বিস্তৃত আখ্যান তিনি বলে গেলেন-- কটন কলেজ গ্রেড ওয়ান পেল, মুরারীচাঁদ এর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েও কেন বঞ্চিত ইত্যাদি। এরা দাবি করে বসল আসামে হাইকোর্ট এলে তা যেন সিলেটে হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সব কিছুকে পেছনে ফেলে দিচ্ছিল।

আসাম বিধান পরিষদে নাকি যোগেন্দ্রনাথ গোঁহাই সেদিন অরুণ চন্দমশাইয়ের প্রশংসা করে বলেছিলেন- তাঁর জন্যই গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে টানা হ্যাঁচড়ার অবসান হয়। তিনি প্রকৃত অর্থেই গোটা আসামের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। সুরমা ভ্যালি আর আসাম ভ্যালির মধ্যে কোন পার্থক্য তিনি দেখতেন না। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তা ছাড়াও অমিয়কুমার দাস আর দেবেশ্বর শর্মা তাঁদের আত্মজীবনীতে অরুণবাবুর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।

দেবব্রতবাবু বললেন চন্দমশাই সিলেটিদের শুধু সংহতই করলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হিসেবে প্রাগজ্যোতিসপুর-গৌহাটিকে গ্রহণ করার ব্যাপারেও একটি ঐক্যমত আনলেন। তাঁকে সেদিন সমর্থন করেছিলেন আসামের ডিপিআই মিস্টার স্মিথও। পেছন থেকে টিপ্পনি কাটলেন তারাশঙ্কর পুরকায়স্থ, 'ভাগ্য ভাল। বিশ্ববিদ্যালয়টি যদি রাজধানী শহর শিলঙে স্থাপিত হত, তবে তো মহা কেলেঙ্কারিই হত।'

'তা ঠিক', বললেন দেবব্রতবাবু, 'একটি রাজধানী শহর সরিয়ে আনা যত সহজ, একটি বিশ্ববিদ্যালয় আনা এত সহজ নয়। সারা বিশ্বে এই সিল, এম্বেলেম, আর ঠিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, এটাকে বদলানো সহজ ব্যাপার

নয়। কারা যে ধুয়া তুলেছিল গৌহাটিকে গুয়াহাটি বানিয়ে সাইনবোর্ড টাঙাবে 'গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়', পারল কই? এরা শহরের নাম হয়ত একদিন পাল্টে ফেলতে পারে কিন্তু 'গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়' এই বানানে স্থিত না থাকলে এতে তো বিশ্ব থাকবে না, হয়ে যাবে বিদ্যালয়'' বলে তিনি হাসলেন।

তারাশঙ্কর ফোড়ন কাটলেন, "হিন্দুস্তানে শশুরবাড়ি পাকিস্তানে ঘর, মধ্যিখানে ভূতের নৃত্য বৌ যে হইল পর' এই দশা হইত বিশ্ববিদ্যালয়টির।'' বলেই দরজার আড়ালে।

প্রেমেন্দ্রবাবু আজকাল খুবই ব্যস্ত। তাঁর অবর্তমানে দেবব্রতবাবুর বাড়ির আসর কেমন নিস্প্রভ। তিনি বোধহয় কিছুটা ইচ্ছে করেই আসছেন না। কারণ শিক্ষক আন্দোলনের সূত্রে বিদ্যালয় পরিদর্শক মহোদয়ের সঙ্গে তাঁদের ইদানীং প্রবল মতপার্থক্য এবং বাক বিতণ্ডাও হচ্ছে। নগেনবাবু যদিও অফিস থেকে বেরিয়ে অন্য মানুষ, তবুও প্রেমেনবাবু ওঁকে একটু এড়িয়ে থাকতে চান।

এখন মহীতোষ পুরকায়স্থ জিসি কলেজের সভাপতি। তাই কথা প্রসঙ্গে জিসি কলেজ এসে যায়। দেবব্রতবাবু এতে খুব উৎসাহ দেখান না। কী পরিপ্রেক্ষিতে এ কলেজ ছেড়ে কাছাড় কলেজে চলে আসতে হল এ সব তাঁর মোটেই প্রিয় বিষয় নয়। আজ আসরে এলেন বিজয়ভূষণ হাজারিকা। শিলচরের আসমিয়াবস্তির ছেলে, জিসি কলেজে দেবব্রতবাবুর ছাত্র ছিল। ইতিহাসে গবেষণা করে পিএইচ ডি পেয়েছে। সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে আধিকারিক পদে বহাল হয়ে এসেছে স্যারকে প্রণাম জানাতে। এ সূত্রে কলেজের পুরনো দিনের কথা উঠল, উঠল ইতিহাসের অধ্যাপক বি, কে, সির কথা, ইকোনমিক্সের বি, কে দে প্রসঙ্গ। সুনামগঞ্জের এ অধ্যাপকের মুখের কোন রাখ ঢাক ছিল না। হরিপদ ভট্টাচার্য নাকি অর্থবই পড়ে পণ্ডিত, নাটকীয় ভঙ্গিতে কথা বলে আসর মাত করেন। দেবব্রতবাবুকেও কী সব বলতেন। এসব শুনে দেবব্রতবাবু হাসছেন। তিনি বোধহয় ছাত্রদের সাহায্যের জন্য একটি নোটবইও লিখেছিলেন। আর যায় কোথায়? এ নিয়ে অধ্যাপক দে কত কথাই না বললেন। তিনি অবশ্য দেবব্রতবাবুর মৌলিক গবেষণার কোন খবর রাখার প্রয়োজনই মনে করেন নি। কাছাড়ের আবার ইতিহাসই কী আর তার আবার ঐতিহাসিকই বা কী? বি কে দে কথায় কথায় দেওয়ান কবি হাসন রাজার প্রসঙ্গ টানতেন। কী জানি হয়ত তাঁকে স্বচক্ষে

দেখতেও পারেন। তবে কঠিন অর্থনীতির তত্ত্ব একেবারে সহজ ভাবে বুঝিয়ে দিতেন এ পণ্ডিত ব্যক্তিটি। কোরানটিও বোধহয় বেশ ভাল ভাবে রপ্ত করা ছিল তাঁর। একে ওঁকে ধরে কোরান আর বেদান্তদর্শন নিয়ে এক তরফা বক্তৃতা শুরু করে দিতেন যখন তখন।

পুরনো দিনের প্রসঙ্গ উঠলে দেবব্রতবাবু সরব না হয়ে পারেন না। ছিলেন বটে অধ্যক্ষ জে, কে চৌধুরি মহাশয়। সব দিকে চৌখস। এ কে চন্দের পর এত বড় অধ্যক্ষ আর পাইনি আমরা। মধ্যিখানে হঠৎ রাঘববাবু নিবারণ লস্কর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন, 'এই ব্যক্তিকে বঞ্চনা করাটা আমাদের পক্ষে একটা লজ্জার ব্যাপার স্বীকার করতেই হবে। তাঁর পাণ্ডিত্য কতটুকু, প্রশাসনিক ক্ষমতা কতটুকু এসব দূরে সরিয়ে রেখেও তাঁকে প্রাপ্য সম্মানটি আমরা দিতে পারি নাই', বলে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। সবাই বুঝতে পারছেন গান্ধী মহারাজের শিষ্য ভট্টাচার্য মশাইয়ের ক্ষোভের জায়গাটি কোথায়?

আলোচনার মোড় ফিরে গেল অন্যদিকে-- জে, কে চৌধুরি 'পূর্বাচল আন্দোলনে'র একজন তাত্ত্বিক নেতাও বটে। বিশেষ করে ১৯৫৬ সালে স্টেট রি-অর্গেনাইজেশন কমিশনের কাছে এই দাবি পুনরুত্থাপনের সময় তিনিও অগ্রণীর ভূমিকা নেন। 'পূর্বাচল রি-কনসিডার্ড' দলিলটি তাঁরই লেখা। কাছাড় পৃথকীকরণ প্রসঙ্গটি এই মুহূর্তে মহীতোষবাবুর কাছে খুব সুখপ্রদ বিষয় নয়। তিনি দু বার বা' হাতে চামড়ার বেল্টওয়ালা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠব উঠব করছেন।

১৪

প্রেমেন্দ্রবাবুর টেবিলে একখানা বই। লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী। এতে ক্ষুদ্র কলেবরের একটি নিবন্ধ তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাঠ করছেন, 'হতভাগ্য কাছাড়'। এত অন্তরঙ্গ ভাবে কাছাড় নিয়ে এত অল্প পরিসরে এত বেশি কথা তো কেউ লেখেননি। বছর দুয়েক আগে সৈয়দ সাহেব শিলচর গুরুচরণ কলেজে এসেছিলেন একটি বক্তৃতা দিতে। প্রেমেন্দ্রবাবুর যাওয়া হয়নি শুনতে। কলকাতার একটি পত্রিকায় লেখা এ নিবন্ধটি এখন একটি গ্রন্থে সংকলিত হয়ে তাঁর হাতে এসেছে। লেখক ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে কৈফিয়তের ঢঙে বলছেন— 'প্রশ্ন উঠতে পারে, কাছাড়ের ভাষা আন্দোলন যখন তার চরমে তখন

সম্পূর্ণ নীরব থেকে আজ এত দিন পরে সেই পুরোনো কাহিনী নিয়ে পড়ি কেন?' কয়েকটি পঙক্তি তাঁর মনে গেঁথে গেছে—

> আসলে তখন ভাষা আন্দোলন রাজনৈতিক রেষারেষি তিক্ততায় রূপান্তরিত হয়েছে, এমন কি কোনো কোনো স্থলে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছে—অথচ কাছাড়ে কস্মিনকালেও কোনো প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। হিন্দু মুসলমান, মণিপুরী (তাদের ভিতরেও হিন্দু মুসলমান দুইই আছে), নাগা, লুসাই এবং আরও কত যে জাত বেজাত কাছাড়ে সখ্যভাবে বসবাস করে সে সম্প্রীতি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

প্রেমেন্দ্রবাবু পড়ে চলেছেন, 'কাছাড় আর্য সভ্যতার শেষ পূর্বভূমি, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির শেষ পূর্ব প্রত্যন্ত প্রদেশ।' এ আলী সাহেবের এক অগ্রজ ছিলেন কাস্টম ইন্সপেক্টর। তাঁর গঞ্জিকা দহন কাণ্ড নিয়ে মুজতবার রচনাটি পড়ে প্রেমেন্দ্রবাবু তো হাসতে হাসতে লুটোপুটি। এই ইন্সপেক্টর সাহেব আবার ছিলেন একজন ঐতিহাসিকও। মুজতবা আলী তাঁর অগ্রজ সৈয়দ মরতুজা আলীর বরাত দিয়ে বলেছেন 'কাছাড়ের রাজারা দীর্ঘকাল পূর্বেই বাংলা ভাষা গ্রহণ করেন।' (ঐ যুগের আসাম ও বাংলার চার রাজবংশের মধ্যে বাংলায় লেখা চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজের উল্লেখও করেন)। যে কথাটি মুজতবা সাহসের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন তা হল কাছাড়ের জমিদার সহ সাধারণ মানুষও দেশ বিভাগের ফলে সহস্র বা লক্ষাধিক শরনার্থীকে আশ্রয় দিতে কোন কুণ্ঠাবোধ করেনি। কথাটা যে কত খাঁটি তা তিনি ছাড়া আর কেই বা অনুভব করবে? তাঁর মনে এল বড়খলার যতিবাবুর কথা—এ ব্যক্তিটি উদ্বাস্তুদের নিঃসঙ্কোচ চিত্তে আহ্বান করেছেন এই ভূমিতে। এ জন্য তাঁকে কেউ নিন্দা করেছে বা সম্মানের কোন হানি হয়েছে তাও তো নয়। অবশ্য নির্বাচনে তাঁকে ওই সাহায্যপ্রার্থীরাই ভোট দেয়নি। মুজতবা আলী অবশ্য জানেন, আসাম সরকার কাছাড়বাসীর এ উদারতাকে মোটেই প্রশংসা করবেন না। তিনি বলেন, 'চৈতন্যভূমি শ্রীহট্টের শত শত ব্রাহ্মণকে কাছাড় আশ্রয় দিয়ে সংস্কৃত চর্চা যে কতখানি বাঁচিয়ে রাখলো তার খতিয়ান হওয়া উচিত'।

মুজতবা আলী জানান যে আসামের রাজ কর্মচারি তাঁর অগ্রজ নাকি ১৯৪১ সালেই লক্ষ করেছেন আসামে সেন্সাস নিয়ে কারসাজি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

সিলেট পাকিস্তানে চলে যাওয়ার ফলে কাছাড়ের বঙ্গভাষীগণ যে 'নগণ্যাধম মাইনরিটি' হয়ে গেল এটা খুব দুঃখের সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন। তার ন্যায্য পাওনা যা ছিল তাও পেল না—সেন্সাস নিয়ে কারসাজির ফলে।

পড়তে পড়তে প্রেমেন্দ্রবাবুর চোখ এক জায়গায় এসে স্থির হয়ে গেল— 'আজ যদি অসমিয়ারা কাছাড়বাসীর মাতৃভাষা ভুলিয়ে সেখানে অসমিয়া চালাতে চান তবে কেউ আশ্চর্য হবেন না। তবে সেটা যে অন্যায় সে কথা নিশ্চয়ই বলতে হবে।' প্রেমেন্দ্রমোহন মনে বল পেলেন মুজতবা আলীর কথায়, 'কাছাড়িরা বাংলাভাষা ও তাঁদের বাঙালি ঐতিহ্য কখনো ছাড়তে পারবে না—অহমিয়া ঐতিহ্য অনেকগুণ শ্রেষ্ঠ হলেও পারবে না।'

আলি সাহেবের একটি স্বপ্ন সফল হয়েছে। তিনি আকাশবাণীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন শিলচরে একটি বেতারকেন্দ্র হওয়ার প্রয়োজন। কেন? কাছাড়ের লোক সচরাচর ঢাকা বেতার শোনে, কলকাতার প্রচার এখানে ভালো করে পৌঁছোয় না। প্রেমেনবাবুর স্মরণে এল ঢাকা থেকে সেই 'মোদের সোনার পাকিস্তান' শুনে শুনে ক্লান্ত হওয়ার দিনগুলি। আর বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের দিনে ওদের নিরন্তর অপপ্রচার— পাকিস্তানি ফৌজ মাসিমপুর দখল করে নিয়েছে, শিলচর তাদের পদানত। তখন বার বার মনে হত আমাদের এ অঞ্চলের সুরক্ষার জন্যও একটা নিজস্ব বেতার কেন্দ্রের প্রয়োজন। আর যে কথাটি খুব মনে ধরার মত, তা হল নাগা, লুসাইদের জন্য প্রচারকর্ম করার জন্য গৌহাটি নয়, শিলচরই সর্বোত্তম কেন্দ্র।

যাই হোক আকাশবাণীর শিলচর কেন্দ্রটি স্থাপিত হল, এবং বাংলাভাষার সঙ্গে সঙ্গে ডিমাসা, মণিপুরি ভাষায়ও প্রচারের ব্যবস্থা হল। মুজতবা আলীর প্রতি কৃতজ্ঞতা সূচক চিঠিটি লেখাটি হয়ে উঠল না, এই দুঃখ রয়ে গেল। যদি কোন দিন সুযোগ হয়, কাছাড়বাসীর পক্ষ থেকে মুজতবা আলীর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে এ ঋণ স্বীকার আমাদের করতেই হবে।

১৫

ইদানীং দেশে সাম্প্রদায়িকতা সাম্প্রদায়িকতা খেলা বেশ জমে উঠেছে যার আঁচ এই কাছাড় জেলাতেও লেগেছে। মুজতবা লিখেছেন কাছাড়ে কোন দিন

সাম্প্রদায়িক ভেদভাবনা ছিল না। কিন্তু চারিদিকের হালচাল দেখে প্রেমেন্দ্রবাবুর মনে হয় কাছাড় বুঝি আর সেই ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারছে না। সাতচল্লিশের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠার পর সাম্প্রতিক দশকে যেন ওই ঐক্য ভাবনায় ফাটল ধরাতে কিছু চক্র সক্রিয় হয়ে উঠছে। শরনার্থীর ঢল নামার সময় তো এ ভূমিটি শান্তই ছিল, যা কিছুটা অস্বাভাবিকও লাগছিল বটে। এত এত লোক আসছে এখানকার সম্পদে ভাগ বসাতে। কাছাড়ের আদি বাসিন্দা হিন্দু-মুসলিম কেউই তো কোনও বাদ সাধলেন না। আসাম উপত্যকায় কিন্তু সোরগোল শুরু হয়ে গেছে, সরকারের উপর চাপও এসেছে, কিন্তু কাছাড়ের পরিস্থিতি ভিন্ন। তিনি নিজেও আসা অবধি এ দিক থেকে কোন ধরনের সংকটে পড়েননি। কাছাড়বাসীর আতিথ্য তাঁকে এখনও অভিভূত করে।

কিন্তু আজকাল কান পাতলে একটু ভিন্ন সুর শোনা যায়। শান্তিপ্রিয় কাছাড়বাসীর মনে 'আমাদের' আর 'ওদের' ভাবনা ক্রমেই মাথা চাড়া দিচ্ছে। এক একটা নির্বাচন আসে আর কাছাড়বাসী কিছুদিনের জন্য দুইটি শিবিরে ভাগাভাগি হয়ে যান। 'হিন্দু না ওরা মুসলিম' এই প্রশ্ন তোলার মানুষ ক্রমে যেন সরব হচ্ছেন। হিন্দুস্তান-পাকিস্তান, শব্দ দুটো মানুষ আজকাল খুব গাল ভরে উচ্চারণ করে। মনে হয় পুরনো হিংসা আবার ফিরে আসছে। কিছু বিদ্বেষ জাগানো চটিবইও অনেকের হাতে হাতে ঘোরে। এগুলো পড়ে কেউ কেউ এখানে ওখানে বিস্তর তর্কাতর্কিতেও নেমে যান। স্কুলের ছাত্রদের কথাবার্তায়ও ধর্মীয় বিদ্বেষের আঁচ পেয়ে প্রেমেন্দ্রমোহন রীতিমত আতঙ্কিত। তাঁর স্কুলে ছাত্রদের ঝগড়া মারপিঠের মাঝেও জাত ধর্ম নিয়ে এমন সব গালাগালি তাঁর কানে আসে যে তিনি হতাশ হয়ে যান। কেউ কি কেউ সুচতুর ভাবে এদের মধ্যে হিংসার বীজ ছড়িয়ে যাচ্ছে? কা'কে সন্দেহ করবেন? কা'কেই বা শাসন করবেন? দেশ স্বাধীন হয়েছে, ধর্ম নিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করেছে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে, কিন্তু যদি গণতান্ত্রিক আদর্শ, ধর্ম নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা আমাদের না থাকে, তবে তো এ সমাজকে সঠিক দিশা দেখাতে আমরা অক্ষম হব। শিক্ষক ছাত্র যুবসমাজকে জাতীয় আদর্শে দীক্ষিত করে তোলাও প্রয়োজন। আজকাল স্কুলে সপ্তায় একদিন ছুটির পর এক একটা দলে ভাগ করে ছাত্রদের জাতীয় আদর্শ, গান্ধী দর্শন, রবীন্দ্রসাহিত্য, বিবেকানন্দ, নেতাজির স্বপ্ন নিয়ে কিছু বিশেষ

আলোচনার আয়োজন করছেন। অবশ্য খালি পেটে এসব চর্চা ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেই বা কী করে? সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা অবশ্য আছে। তবে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ছাত্রদের দিয়ে স্কুল বাড়ির বিশেষ বিশেষ স্থানে মহাপুরুষদের বাণী লিখে বসানো শুরু করতেই দেখা গেল ওরা রঙ তুলি কালি কাগজ নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল। দিন কতক সেই কী উন্মাদনা। বাণী নির্বাচনের দায়িত্বটা ওদের হাতে দিলে ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল লাইব্রেরির আলমারিতে। প্রেমেন্দ্রবাবু বুঝলেন নিজের অজান্তেই এরা হয়ে গেল বইমুখী। যে শিক্ষকরা দূরে সরে ছিলেন, এরাও একটু একটু করে এগিয়ে এলেন। তিনি তো ছুটির পর এদের জোর করে আটকে রাখতে পারেন না। এরপর গল্প, কবিতা, গান, বক্তৃতার বৈঠক বেশ জমে উঠতে থাকল। সেদিন এক ছাত্র জিজ্ঞেস করল কোন বানান ঠিক-- পাকিস্তান না পাকিস্থান, হিন্দুস্তান না হিন্দুস্থান? শব্দদুটোর অর্থই বা কী?

'দাঁড়া রে বাবা, অভিধান বের করি।'

প্রেমেন্দ্রবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন, আমাদের পাঠ্যবই এমনকী সমাজ, ইতিহাস বিষয়ক বইতেও এ বানানের কোন সমতা নেই। যদৃচ্ছভাবে কখন হিন্দুস্থান কখনও হিন্দুস্তান বলা হয়েছে। নিজের মনে মনেই বললেন যাঁরা হিন্দুস্থান বলছেন, এরা বুঝি ভাবছেন দেশটা একান্তভাবে হিন্দুদের নিজস্ব? পুথিপত্র ঘেঁটে দেখলেন হিন্দুস্তান শব্দটি এসেছে ফার্সি হিন্দুস্তাঁ থেকে। মুসলিম পণ্ডিতেরা একটি ভৌগোলিক অঞ্চল বোঝাতেই এ শব্দের প্রয়োগ করেছেন, কোনও জাতি বা ধর্মসম্প্রদায়ের অনুষঙ্গ এতে নেই। আর হিন্দু শব্দটিও আদিতে ছিল স্থানবাচক শব্দ, জাতিবাচক নয়। আরও জানলেন এই শব্দটিও আমরা ইসলামিক সূত্রে লাভ করেছি। অর্থাৎ আমরা হিন্দু-- কারণ মুসলিমরা আমাদের এ নামে ডেকেছেন। ক্লাস নাইন-টেন-ইলেভেনের ছাত্রদের কৌতূহল দেখে প্রেমেন্দ্রমোহন দিন কতক ঘাঁটাঘাটি করলেন সুনীতিবাবুর 'ভারত সংস্কৃতি' আর ইংরেজি 'অডিবিএল', অল বেরুনির 'কিতাব-উল-হিন্দ'এর বাংলা সংস্করণ। সিলেবাসের বাইরে এ বিচরণ তাঁর চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনছে, তিনি বুঝতে পারলেন। পরবর্তী আলোচনায় ছাত্রদের বুঝিয়ে বললেন কী করে আদি পারসিক ভাষা থেকে হিন্দু শব্দটি ব্যবহারে এল। সিন্ধু নদের তীরবর্তী অঞ্চলকে

বোঝাতে এ স্থানবাচক শব্দটি ব্যবহৃত হত। এরপর আরবিরা পারসিক এ শব্দের মধ্যে একটু সংযোজন করে তৈরি করলেন নতুন শব্দ 'আল হিন্দ', এবং এই আল-হিন্দের জনগোষ্ঠীকে বললেন *হিন্দ-ই, হিন্দভি* । আর এরপর কী হল জানো? তুর্কিরা সিন্ধুনদের তীরবর্তী জনগোষ্ঠীকে যে শব্দ দিয়ে আখ্যায়িত করলেন এ শব্দটিই হল হিন্দু।

তিনি আক্ষেপ করে বলেন, আমাদের ছাত্রদের শেখানো হয় হিন্দুস্থান। যারা শেখান, আর যাদের শেখানো হয় এরা বোঝেন দেশটি একান্তভাবেই হিন্দুদের। পারসিক শব্দটিকে মাস্টারমশাইরা যে সংস্কৃত বলেই জানেন। এ জানায় কিছু এসে যায় না, কিন্তু অব্যক্ত যে কথাটি তাঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় তা হল হিন্দুস্থান হিন্দুদের নিজস্ব ভূমি, অন্যরা এখানে অনাকাঙ্ক্ষিত। এখানেই তো মৌল গলদ। যারা দেশভাগের ফলে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়ে 'হিন্দুস্থান' বলে চিহ্নিত ভূমিতে এসেছে এরা এই দেশের নামের মধ্যেই একটা আধিপত্যবাদের স্বাদ পাচ্ছে। বিষয়টি বড্ড জটিল। মনে হয় নিজের কাছেও যেন সব কিছু অস্পষ্ট। সংবিধানে আছে ইন্ডিয়া, দ্যাট ইজ ভারত, এখানে হিন্দুস্তান বা হিন্দুস্থান শব্দ তো নেই। কিন্তু চারিদিকে ভারত নয়, বরং হিন্দুস্থান শব্দটিরই জয়জয়কার।

ছাত্রদের আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাকি। পাকিস্তান শব্দের অর্থ কী? এবার তো মৌলবিস্যারের শরণাপন্ন হতে হবে। তিনি বিশাল সাইজের এঙ্গলো-আরবীয় ডিকশনারি ধূলি ঝেড়ে পরিষ্কার করে সামনে মেলে ধরলেন, "স্যার, দেখুন পাক মানে পবিত্র, *পাক- ই- স্তান* মানে পবিত্র স্থান।"

নাম তো সুন্দরই, কিন্তু গোটা উপমহাদেশকে বি-পাকে ফেলে এ কেমন পাকিস্তান নাম ধারণ!

তবে এই 'পাক' শব্দটিই তাঁর মাথা ঘুরিয়ে দিল আরেক কারণে। বিজাতীয় শব্দটির সঙ্গে যে সংস্কৃত সংশ্রব রয়েছে। সংস্কৃত 'পক্ব' শব্দটি যে এর কাছাকাছি। আমরা অহরহ 'পাকের ঘর', 'পাক করা' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করি। আসলে পাক করা মানে তো খাদ্যদ্রব্যকে পবিত্র, সুপক্ক করে গ্রহণের উপযোগী করে তোলাও বটে। আর আমাদের মা, কাকি, জ্যেঠিদের কাছে ঠাকুর ঘরের

মতোই আরেকটি পবিত্র ঘর হল পাক ঘর। আমরা হিন্দু মুসলমান নিজেদের মধ্যে করি ঝগড়া, আর ওদিকে আরবি-ফার্সি-সংস্কৃত ভাষা সুযোগ পেলেই নিজেদের মধ্যে গলাগলি করে। দিন কতক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণসন্তান প্রেমেন্দ্রমোহন স্কুলের আরবি শিক্ষক, তাপাদার সাহেবের সঙ্গে ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব চর্চায় মেতে রইলেন। বুঝলেন মোল্লা-মৌলবির সাহায্য ছাড়া যে বাংলায় বিদেশি শব্দের ব্যুৎপত্তি জানা অসম্ভব। আর মৌলবি সাহেবও এত দিন পরে বুঝলেন দেশি ভাষা বিদ্যা চর্চায় তাঁরও প্রয়োজন আছে।

ব্রাহ্মণ ব্যক্তিটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর চোখ জলে ভরে এল।

১৬

শিলচর শহর আজ আবার জেগে উঠেছে যেমন উঠেছিল আজ থেকে ৩৭ বছর আগে। সে ছিল 'সুরমা সাহিত্য সম্মেলনে'র দ্বিতীয় অধিবেশন। সেদিনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন কামিনীকুমার চন্দ, আজ তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি আইনজীবী প্রিয়নাথ দেব। সেদিন অধিবেশন সভাপতি হিসেবে এসেছিলেন বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ মহামহপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য সাহিত্যরত্ন, বিদ্যাবিনোদ, আজ এসেছেন কাছাড়ের সন্তান, কলকাতা শহরে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট কবি রামেন্দ্র দেশমুখ্য। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কথাসাহিত্যিক, ভারত পথিক 'মহাপ্রস্থানের পথে' খ্যাত প্রবোদকুমার স্যান্যাল এসেছেন সম্মানিত অতিথি হিসেবে।

সমস্ত জল্পনাকল্পনার অবসান হল যখন শিলচর, হাইলাকান্দি আর করিমগঞ্জের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রিয়নাথবাবু জেলা গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন করে কাছাড় বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের শুভসূচনা করলেন। হাইলাকান্দি থেকে এসেছেন সাংবাদিক-কবি শক্তিধর চৌধুরি, অধ্যাপক বিজয় ধর, হরিদাস দেব, সৈয়দ হোসেন মজুমদার, ভবতারণ ভট্টাচার্য, তরুণ সাংবাদিক নীতিশ ভট্টাচার্য, কবি ব্রজেন্দ্র সিনহা, আর বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য। করিমগঞ্জ থেকে এসেছেন নলিনীকান্ত দাস, চন্দ্রজ্যোতি ভট্টাচার্য, মতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, সতু রায়, নৃপতি চৌধুরি, সুজিৎ চৌধুরি, সুবীর কর আর তরুণতর নির্মল দাস। শিলচরের সদস্যদের মধ্যে আছেন প্রেমেন্দ্রেমোহন

গোস্বামী, মহীতোষ পুরকায়স্থ, প্রভাস সেন মজুমদার, জ্যোতির্ময় সেন, করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, অনুরূপা বিশ্বাস, বিজিৎ চৌধুরি, প্রসূনকান্তি দেব, অনন্ত দেব, নৃপেশ গোস্বামী, জগন্নাথ রায়চৌধুরি।

বিকেল তিনটায় কাছাড় বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী শুরু হল শিলচর জেলা গ্রন্থাগাগার প্রেক্ষাগারে। দুপুর বেলা বিষয় নির্বাচনী সভায় সাংঠনিক প্রস্তাবাদি গ্রহণের পর অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে সবাইকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িতও করা হল। জেলা গ্রন্থাগার আজ লোকে লোকারণ্য। প্রেমেন্দ্রবাবুর আহ্বানে জেলার শিক্ষককূল আজ একেবারে ঝেঁটিয়ে এসেছেন। প্রেক্ষাগৃহ আলো করে প্রথম সারিতে বসে আছেন অধ্যক্ষ দেবব্রত দত্ত, গুরুচরণ কলেজের উপাধ্যক্ষ মেহেরাব আলী লস্কর, অধ্যাপক ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত দাস, মহীতোষ পুরকায়স্থ, ব্যারিস্টার আবুল ফজল গোলাম ওসমানী, আইনজীবী অনিলচন্দ্র বিশ্বাস, দিলীপ দেব, প্রভাস সেন মজুমদার। প্রিয়নাথবাবুর সভাপতিত্বে সভার সূচনায় সম্পাদক সুসিতকুমার দত্ত সভার উদ্দেশ্য ব্যখ্যা করে সবাইকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাগত জানালেন। দিনটি ছিল ৮ জানুয়ারি, ১৯৭৭ সাল। মঞ্চে বরণ করা হল দুই অতিথিকে— কথাসাহিত্যিক প্রবোদকুমার সান্যাল এবং কবি রামেন্দ্র দেশমুখ্যকে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রী প্রিয়নাথ দে তাঁর স্বাগত ভাষণে কাছাড়ের সুসন্তান লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি শ্রী রামেন্দ্র দেশমুখ্য এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঔপন্যাসিক ও পরিব্রাজক শ্রী প্রবোধকুমার সান্যালকে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত কবির শহর শিলচরে অভর্থনা জানাতে পেরে সম্প্রদায় নির্বিশেষে কাছাড়বাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে বিশেষ পুলকিত ও গর্বিত এ কথাটি জানিয়ে দিলেন। তিনি কাছাড়ের প্রাচীন প্রসঙ্গ টেনে বলেন যে, স্মরণাতীত কাল থেকেই কাছাড় শ্রীহট্টের মধ্য দিয়ে ভারতভূমির মূল ঐতিহ্যের সঙ্গে বিলগ্ন। তিনি ঢাকা দক্ষিণের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, এই শ্রীহট্ট থেকেই কাছাড় হয়ে মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাচার বিস্তার লাভ করে, এ বিস্তৃত অঞ্চলে বৈষ্ণবীয় সাহিত্যের বিকাশ ঘটে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে কাছাড়ের ভূমিকা নিয়ে তিনি বললেন যে এই শহর শিলচর মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং বাগ্মী বিপিন পালের পদস্পর্শধন্য শহর। স্বাধীনতা এবং দেশভাগ, ছিন্নমূল উদ্বাস্তদের কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন কাছাড় এদের জন্য আতিথেয়তার দক্ষিণহস্ত উদারভাবে প্রসারিত করে রেখেছিল। তিনি গৌরবের সঙ্গে কাছাড়ের উদার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির কথাও বললেন। একাদশ ভাষাশহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন— ভাষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে একদশ প্রাণ নির্বাপিত হয়েছে কিন্তু কাছাড় কখনও অন্ধ ভাষামোহে আচ্ছন্ন হয়নি, সংকীর্ণ হয়নি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। সভাপতির এ উদ্বোধনী ভাষণেই নবজাত সংগঠনটির মূল দর্শন মূর্ত হয়ে উঠল। শ্রোতার আসনে বসা অতিথিরা প্রত্যক্ষ করলেন কাছাড় বঙ্গসাহিত্যের প্রাথমিক পদক্ষেপ।

সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও কয়েকজনের বক্তব্যের পর দাঁড়ালেন কবি রামেন্দ্র দেশমুখ্য। হাততালিতে তাঁকে অভিবাদন জানালো পুরো প্রেক্ষাগৃহ। নিজ মাতৃভূমিতে এ উষ্ণ আহ্বান তাঁকে ক্ষণেকের জন্য বাকরুদ্ধ করে রাখল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে কবি রামেন্দ্র দেশমুখ্য উচ্চারণ করলেন কয়েকটি অনুপম পঙক্তি-

শ্রাবস্তী বিদিশা থেকে শিলচর শহর

আরো মনোরমা;

---এটুকু শুনেই সারা প্রেক্ষাগৃহ আবার উত্তাল। করতালি থামলে কবি আবার শুরু করলেন,

গ্রীবাময় মালোপমা, শ্যামশ্রী শরীর,
মোহিনী বরাক কণ্ঠী ষোড়শীর বেশে
দেশে দেশে খুঁজেছে আমাকে!

অবশেষে বৃদ্ধ কবি ফিরেছি স্বদেশে
দেখি, তার স্নিগ্ধ চোখে নিবিড় সুষমা,
প্রতীক্ষার সুরভিতে এ জেলার ভরেছে অঙ্গন
কবিতার কঙ্কন ধ্বনিতে

মাঘের শ্রবণা মাখে কুয়াশার কপালে চন্দন।

সেই দুটি ঘন চক্ষু, অনমিত পল্লবে নিবিড়
পারাপারহীন প্রেমে মহামৌন সবুজ শহর,
শ্রীমতী পূর্ণিমা এসে মুগ্ধ চোখে বলে,
স্তব্ধ এই জন্ম জন্মান্তরে
আজ রাতে বক্ষে বাঁধো প্রেমিকা শহর।

কবিতার আবেদন যে কত গভীর হয় সেদিনের কানায় কানায় ভরা প্রেক্ষাঘরের প্রত্যেক শ্রোতাই মর্মে মর্মে অনুভব করলেন। কেবল শিলচর শহরের নয়, সমগ্র কাছাড় জেলারই বুঝি এরকম কবিতারই সুশ্রুষার প্রয়োজন ছিল। উদ্বোধনীতে এই কটি পঙক্তি উপহার দিয়ে কবি সবার প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়ে বিনম্র নমস্কার জানিয়ে আসন গ্রহণ করলেন।

কাছাড়বসীকে উষ্ণ অভিবাদন জানিয়ে পরিব্রাজক কথাসাহিত্যিক প্রবোদকুমার সান্যাল তাঁর অনির্বচনীয় কণ্ঠে সম্ভাষণ জানালে শ্রোতৃমণ্ডলি আবার করতালিতে মুখরিত করে তুললেন প্রেক্ষাগৃহটিকে। দীর্ঘদেহী ব্যক্তিটির চেহারার মধ্যেই যেন পুরো ভারতবর্ষের একটা চিত্রপট অঙ্কিত হয়ে আছে। তাঁর সংক্ষিপ্ত কথন যেন হিমালয় থেকে নেমে আসা আদি অনাদি ভারতের মুণির উচ্চারিত মন্ত্র হয়ে সবাইকে মোহাবিষ্ট করে রাখল কিয়ৎকাল। আসলে তাঁর 'মহাপ্রস্থানের পথে' গ্রন্থটির আবেদন যে সবার মনে গভীরভাবে প্রথিত। পড়ন্ত সন্ধ্যায় তাঁর কণ্ঠে কবিগুরুর বহু পরিচিত কবিতার কয়েকটি পঙক্তি সবাইকে উন্মনা করে দিল—

আমি চঞ্চল হে, আমি সুদুরের পিয়াসি।
দিন চলে যায় আমি আনমনে
তারই আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে--
ও গো, প্রাণে মনে আমি যে তাঁহার পরশ পাবার প্রয়াসী।।

ও গো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি--
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই, সে কথা যে যাই পাশরি।।

কাছাড়ের নিজস্ব যে সাহিত্য সংগঠন আত্মপ্রকাশ করছে আজ, এর মানসিক ব্যাপ্তি যে সুদূরপ্রসারী সেটা এই উচ্চারণের মাধ্যমে উপস্থিত দর্শক শ্রোতার মনের মধ্যে গভীর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সমস্ত সংকীর্ণতার গণ্ডি অতিক্রম করে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়াটাই বুঝি বা এ সংগঠনের ভবিতব্য। পরিব্রাজক কথাকার প্রবোদকুমার সান্যালের এ সম্মেলনের উদ্বোধনীতে উপস্থিতি একটা বিশেষ প্রতীকী তাৎপর্যে উদ্ভাসিত।

১৭

দ্বিতীয় দিনের প্রতিনিধি সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাব বিকেলে প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থাপন হলে সমবেত দর্শক-শ্রোতা প্রকৃতই অনুভব করলেন কাছাড়ের বৌদ্ধিক জগৎ বলে একটা জগৎ রয়েছে, যারা রাজনীতির পথে নয় বৌদ্ধিক আন্দোলনের মাধ্যমে নিজস্ব অধিকার আদায়, মানসিক সামাজিক উৎকর্ষ বিকাশের বিকল্প পথ অন্বেষণ করছেন। দিনভর প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রস্তাবাকারে নিজস্ব মতামত রেখেছেন ঐতিহাসিক দেবব্রত দত্ত, কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, ব্যারিস্টার আবুল ফজল গোলাম ওসমানি, অধ্যাপক বিজিৎ চৌধুরী এবং প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামী।

একটা প্রতিনিধি সম্মেলন যে কত আকর্ষণীয় হতে পারে সেটা সূচনা থেকেই বোঝা গেল। সাহিত্য সম্মেলনে এখানকার কবি সাহিত্যিক, শিল্পীদের কথা উঠবে না তা হতে পারে না। এখানে কোন প্রকাশনার সুবিধা নেই। প্রকাশনা পর্যদ তো বাংলা বই প্রকাশের কথা ভাবছেই না, কাছাড়ের লেখক শিল্পীদের কোন ভাবে পুরস্কৃত করারও ব্যবস্থা নেই এ নিয়ে বিস্তর বাক বিতণ্ডা হলে পর বিজিৎ চৌধুরী, জগন্নাথ রায়চৌধুরী, তারাশঙ্কর পুরকায়স্থ, প্রভাতরঞ্জন চন্দের প্রয়াসে এ মর্মে দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হল। এরই সূত্র ধরে দেবব্রত দত্ত স্থানীয় জেলা গ্রন্থাগারে বাংলা বইয়ের অপ্রতুলতার কথা উত্থাপন করেন। ভাষা সাহিত্যের চর্চা ও গবেষণার প্রয়োজনীয় গ্রন্থের যোগানের মাধ্যমে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

গোলাম ওসমানী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেন, 'এই যে আমাদের বেতার কেন্দ্র, এটা যে ক্রমে ক্রমে আমাদের ব্যথার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে যদি না আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করি এখনই'। কাছাড় জেলার তিনটি মহকুমার বুদ্ধিজীবী ও বৃত্তিভিত্তিক প্রতিনিধি নিয়ে একটি উপদেষ্টা পর্যদ গঠন করা প্রয়োজন। সে সঙ্গে কেন্দ্রটির প্রচার তরঙ্গকে আরো শক্তিশালী করা এবং স্থানীয় সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করার প্রস্তাব রাখেন।

গান্ধী শান্তিপ্রতিষ্ঠানের সভাকক্ষে যখন এ গুরুত্বপূর্ণ সভা চলছে তখন জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে চলছে কবি সম্মেলন। তিন মহকুমার কবিরা নিয়ে এসেছেন তাঁদের কবিতা। আজ বাংলা সাহিত্যের দুই মহারথীকে পেয়ে কবির শহর ভাবাবেগে উদ্বেল। 'কবির শহর' অভিধাটি যিনি দিয়েছেন সেই 'কবি ও কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক, রামেন্দ্র দেশমুখ্য আজ আসরের মধ্যমণি। অনুষ্ঠান পরিচালক বার বার সবাইকে একটি করে কবিতা পাঠ করার অনুরোধ করছেন, যাতে সবাইকে ডাকা যেতে পারে। কিন্তু সমস্যাটি হল কবিতাটি দীর্ঘ না নাতিদীর্ঘ এটা বোঝার কোন উপায় তো নেই। কবি তো পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছেন। পরিশেষে জানালেন তাঁর একটি মাত্র কবিতারই উপস্থাপন যে শ্রোতারা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এ জন্য সাবাই ধন্যবাদার্হ। প্রবোদ স্যান্যাল বসে বসে মুচকি হাসছেন। ওদিকে শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিজিৎ ভট্টাচার্য কবিতার গন্ধে ছুটে এসেছেন। ছুটে এসেছেন ব্রজেন্দ্র সিংহ, করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য, অনুরূপা বিশ্বাস। প্রতিনিধি সম্মেলন শেষের দিকে রেখে সাহিত্য অনুরাগীরা সবাই এদিকে এসে ভিড় জমিয়েছেন। 'শক্তিপদ ব্রহ্মচারীকে চাই' বলে কতিপয় যুবক চিৎকার করলে রামেন্দ্র দেশমুখ্য মাইকের সামনে এসে বললেন, 'আমরা গানের আসরে শ্রোতাদের পক্ষ থেকে দাবি তোলা শুনে অভ্যস্ত, এখন কবিতা শোনার জন্য জন্য শ্রোতার এ উচ্ছ্বাস নিশ্চিতই কবিতার জয় সূচিত করছে। শক্তিপদ আছেন নিশ্চই প্রেক্ষাঘরে, আপনাকে যে আসতেই হচ্ছে।' এ কবির কয়েকটি কবিতা 'দেশ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল, চোখে পড়েছে, কিন্তু রামেন্দ্রবাবু ঠিক মনে করতে পারছেন না তাঁর কোন কবিতার পঙক্তি। অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও এবার শক্তিপদকে

উঠতে হল। তিনি কবুল করলেন, কবিতা তো সঙ্গে নিয়ে আসেন নি। শ্রোতারা নাছোড়বান্দা, সমবেত চিৎকার —'জমির মিঞাঁর জবানবন্দি'।

'ঠিক আছে যতটুকু মনে আছে ততটুকুই বলব, বলেই শুরু করলেন —

জবর দুঃখর কথা, আফশোসে ফাটিছে কলিজা
মবলক দেড়কুড়ি, খুচরা দুই উমরের ইজা
সাকুল্যে বত্রিশ হইল, বেরথ হইল এমন যৈবন
না অইল কামিনী ঘরে, না পাইলাম একখান কাঞ্চন।

শ্রোতা, মানে তরুণ কবির দল হাততালি দিতে লাগলেন অহরহ, আর ওদিকে করুণারঞ্জন রাগে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এসব কবিতা কি শিষ্ট সমাজে উচ্চারণের যোগ্য?

শক্তিপদ বলে যাচ্ছেন-

পিরের মুরশিদ হইয়া ভরমিলাম দেশ দেশান্তরে
যার লাইগ্যা ভুগিলাম ছয়মাস সান্নিপাত জ্বরে
পেটে হইল বিঙ্কামড়ি চউখে ঘোর, বেজায় হলিমা
কোমরে লেঙটি আর গায়ে মাত্র ছিঁড়া-ভিড়া নিমা।

খুরে দিয়া দণ্ডবৎ উঠিলাম আসাম-বেঙ্গলে
সবই লুইট্যা নিছে দেখি পড়িবেশী শিয়ালে হেঙ্গলে
আছিল যা নিজের কইতে, ভাঙা থাল এক কানা ঘটি
উপরে আছেন আল্লাহ, আর আছে কোমরে লেঙ্গটি

---এটুকু বলে দম নিলেন। আর তো মনে নেই। বলে লম্বা এক নমস্কার দিয়ে নেমে গেলেন।

প্রবোদকুমার উঠে উষ্ণ প্রশংসা বাক্যে কবিকে সম্ভাষণ করে জানালেন, এ কবিতায় মাটির ঘ্রাণ আছে, গভীর এক মর্মবেদনা লুকিয়ে আছে। আসাম-বেঙ্গলের উল্লেখমাত্রই দেশ-বিভাগের নির্মম কাহিনী এসে উঁকি দিয়ে যায় ইত্যাদি। তিনি গত সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শোনা একটি গানের প্রসঙ্গ টেনে আরও বলেন কাছাড়ে এসে তিনি হারিয়ে যাওয়া বাংলাকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। একটি লোকগান যে একটা গোটা জাতীয় সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারে সেটা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এ সম্মেলনে এসে। গানটির পদ ছিল– 'জামাই খাওয়াইন্যা মাছ রান্ধুনি পাগলা রে, মেহেমান খাওয়াইন্যা মাছ ইলিশা রে।'

শ্রোতাদের উচ্ছ্বাসের মাঝেই একটা ছিপছিপে রোগা মত ছেলে এসে মাইকের সামনে দাঁড়াল এবং কাঁপা কাঁপা গলায় শুরু করল একটি কবিতা–

পদ্মার সারি বাঁধা ঢেউয়ে
স্বপ্নের কুঁড়িগুলি মোর ফুলদোল,
বাংলার উজ্জ্বল নদী বন
রক্তিম উল্লাসে হিল্লোল
বরাকের কূলে বসে দিন যায়
মৃত্যুর পাশাপাশি বিচরণ --

সমবেত শ্রোতার উচ্ছ্বাস আর করতালিতে শেষ পঙক্তিটি শোনা গেল না। রামেন্দ্রবাবু কবিতাটি শুনে চমকিত হয়ে গেলেন। কী বলবেন ভাবতে ভাবতে মঞ্চে আরেকজন এসে হাজির। তিনি তরুণ কবির নামটি জিজ্ঞেস করলে সে 'জালালউদ্দিন' বলে দৌড় দিয়ে নেমে শ্রোতার ভিড়ে হারিয়ে গেল। কে যেন বলল ছেলেটি নাকি গুরুচরণ কলেজে পড়ে।

সাহিত্য সম্মেলন জমে গেছে। প্রথম দিনে যারা আসেননি আজ সবাই ছুটে আসছেন। কর্মকর্তাদের মাথায় হাত, সাহিত্যের আসর এত তাড়াতাড়ি গোটানো যাবে না, অথচ মধ্যাহ্নভোজের বিরতি দিতে হবে, প্রকাশ্য অধিবেশন শেষ করে করিমগঞ্জ হাইলাকান্দির প্রতিনিধিদের ফিরে যাওয়ার ব্যাপারও আছে। আজ কারও ক্ষিধের তাড়না নেই, সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফেরার বাস পাবেন কি না সে

উৎকণ্ঠাও নেই। মহীতোষ পুরকায়স্থ, শক্তিধর চৌধুরী, দেবব্রত দত্ত, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়কে ঠাঁয় বসে থাকতে দেখে সম্পাদক সুসিত দত্ত চিন্তিত। তাঁর যে সময় মেপে চলতে হয়, এখন যে প্রতিটি সেকেন্ড হাতে গোনার।

গল্পকার, রসসাহিত্যিক গণেশ দে'কে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে শ্রোতারা 'গল্প চাই', 'গল্প চাই' বলে চিৎকার শুরু করলে তিনি বিনীত ভাবে বললেন এ মুহূর্তে গল্প আরম্ভ করলে অন্যদের প্রতি অবিচার হবে, সময় যে নিতান্ত সংকীর্ণ। ভাষা শহিদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে একটি ছোট্ট কবিতা উচ্চারণ করেই তিনি নেমে গেলেন। এগিয়ে এলেন নবীন অধ্যাপক, কবি তপোধীর ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে হাজির একডজন কোলাহলমুখর কিশোর তরুণ উদীয়মান কবির দল। আর 'অতন্দ্র' গোষ্ঠীর কবিরা তো আছেনই। এদের উচ্ছ্বাসে প্রেক্ষাগৃহ কম্পমান। তপোধীর কোন ভনিতা না করেই বলতে শুরু করলেন—

কেউ তো আমার বুক দেখে না, মুখ দেখে না,

চোখ দেখে না

আমি একা, পথের পাশে -

বাকি পঙক্তিগুলো তপোধীরকে বলার সুযোগ না দিয়ে তাঁর অনুগামীরাই গড়গড় করে বলে দিলেন। সভামুখ্য দুই অতিথি কাছাড়ে কবিতার এত জয়জয়কার দেখে স্তম্ভিত। 'পক্ষীরাজ' খ্যাত শিশুসাহিত্যিক জ্যোতির্ময় সেন এসব কাণ্ডকারখানা দেখে একেবারে শিশুর মত দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে তালি দেওয়া শুরু করলেন। মহীতোষবাবুকে দেখে মনে হল তিনিও বুঝি দাঁড়িয়ে যান।

ওদিকে প্রতিনিধি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মতে নবগঠিত কার্যকরি সমিতির সম্পাদকের দায়িত্বভার নিয়ে গুচ্ছের কাগজপত্র সামলাতে সামলাতে দৌড়ে এসে প্রেক্ষাগৃহে পৌঁছোলেন প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামী-- যদি শেষ পর্যায়েও কিছু শোনার সৌভাগ্য হয়। কিছুক্ষণ পর এসে পৌঁছোলেন সহ-সভাপতি এবং সহ-সম্পাদক সহ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রিয়নাথ দেব মহাশয়। প্রিয়নাথবাবুর বিশেষ অনুরোধ অতিথিরা যদি কিছু শোনান।

প্রবোদ সান্যাল মশাই হাতজোড় করে বললেন, 'আমার বনস্পতির ভার তো শেষ বেলার এ সাহিত্যবাসর বইতে পারবে না। এতে যে বিস্তর আগাছা, এসব সরিয়ে দিলে যে সারবত্তা কিছুই থাকে না।'

তাঁর স্বীকারোক্তি, 'গল্প উপন্যাস তো বনসাঁই করে পরিবেশন করতে পারব না।'

রামেন্দ্র দেশমুখ্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রামেন্দ্রবাবু! আমার মুশকিল আসান করুন'। তবে বসার আগে অপূর্ব বাচনভঙ্গিতে তিনি শিলচরে আসা অবধি তাঁর অভিজ্ঞতার একটি নির্যাস দিলেন। ভাষা শহিদের ভূমিতে এসে এ বৃদ্ধ বয়সে যে তাঁর ভেতরের সুপ্ত বাঙালিসত্তার পুনর্জাগরণ ঘটেছে এটা স্বোচ্চারে ঘোষণা করে রামেন্দ্রবাবুকে মাইকের দিকে এগিয়ে দিলেন।

রামেন্দ্রবাবু শ্রোতার আসনে বসা বর্ষিয়ান কবি সুধীর সেন মহাশয়কে অনুরোধ করলেন কিছু শোনানোর জন্য। তিনি ধীর পদক্ষেপে মঞ্চে এসে বললেন কবিতা 'রিহাং নৃত্য'—

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা বুঝি নয়,
মুখে তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য নয়;
তবুও সে দাঁড়াল; এসে আলো আলোকিত মঞ্চের ওপর
বিলম্বিত লয়ে নৃত্যপর—
ডোরাকাটা শাড়ি তার শরীরে পেঁচানো
সাপের মতন,
যেন সে পেরিয়ে এল ত্রিপুরার পাহাড়িয়া বন।...

এবার রামেন্দ্রবাবু তাঁর ফোলিও ব্যাগ খুলে বের করলেন একটি খাতা। বললেন 'এ রকম একটা ঐতিহাসিক সাহিত্য সম্মেলনে ক'জন কবির অনুপস্থিতি অবশ্যই পীড়াদায়ক। আমি বরং কবি অশোকবিজয় রাহা, মৃণালকান্তি দাস আর দেবেন্দ্র পালচৌধুরীকে এখানে হাজির করি'। কারো মতামতের অপেক্ষা না করে স্মৃতি থেকে শোনালেন কবিতাটি-

বেতারে কার সেতার বাজে, বাংলা খবর শেষ
শুনে শুনে পথ দিয়ে যাই, মনে সুরের রেশ,
মফঃস্বলের শহরতলি খানিকটা বন-ঘেঁষা
ঝোপে ঝাড়ে সন্ধ্যা নামে বুনো গন্ধে মেশা ...

ইত্যাদি বলে শেষ করলেন—

মাথার উপর ডাকল পেঁচা, চমকে উঠি-- আরে!
আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে!

আর যায় কোথা? সবাই চিৎকার শুরু করেছে—'দেশমুখ, দেশমুখ'।

রামেন্দ্রবাবু বলেন, 'এই দেশমুখ কি আমি? কবিকে জিজ্ঞেস করা হয়নি'। আছা শুনুন, সামান্য কটি লাইন—

দেশমুখের বাংলোয় নৈশভোজের নিমন্ত্রণ ছিল কাল
ফিরছি অনেক রাতে।
পাহাড়িদের ওপর একখানা বই লিখেছে ও,
একটি অধ্যায় পড়লে—'নাগা নৃত্য'
লোকটা জহুরি—

এরপর মৃণাল কান্তির একটি পঙক্তি, আর দেবেন্দ্র পালচৌধুরীর 'রেলপথে যেতে যেতে ডেকেছিল হাফলং হিল' এর টুকরো বলেই আবেগ ভরে উচ্চারণ করলেন

যখন যেখানে থাকি জন্মভূমি তোমাকে ভুলি নে,
যখন যেখানে থাকি, মনে পড়ে সন্ধ্যার জোনাকি,
নাগেশ্বর, আমলকী, শিরিশের শোভা,
বরাকের শান্ত বাঁকে মধুরার মিলনমোহনা,
অমলধবল জ্যোৎস্না দুধপাতিলের শেষরাতে,
আশ্চর্য ট্রলির লাইন চলে গেছে চায়ের বাগানে,
মনে পড়ে শুভ্রবর্ণা মা'কে
এবং তোমাকে।

সন্ধ্যায় প্রকাশ্য অধিবেশনে কবি রামেন্দ্র দেশমুখ্য তাঁর সুচিন্তিত লিখিত ভাষণের শুরুতে রবীন্দ্রনাথের একটি অজ্ঞাত, অপ্রকাশিত কবিতা উচ্চারণ করলে শ্রোতার আসর কলরব মুখরিত হয়ে উঠল। সিলেটের জনৈক গুণমুগ্ধের নোটবইতে লেখা এ কবিতাটিতে প্রকাশ ঘটেছে তদানীন্তন সুরমা উপত্যকার গভীর মর্মবেদনা। সারা আসর স্তম্ভিত হয়ে শুনল—

মমতাবিহীন কালস্রোতে
বাংলার রাষ্ট্র সীমা হতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি।
ভারতী আপন পুণ্যহাতে
বাঙালির হৃদয়ের সাথে
বাঁধে তব হিয়া
সে বাঁধন তরে তব কাছে
বাংলার আশীর্বাদ
গাঁথা হয়ে আছে।

তিনি কাছাড়ের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ টেনে মহারাণী চন্দ্রপ্রভার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বললেন এ কোচকন্যা, কাছাড়ের মহারাজ তাম্রধ্বজ নারায়ণের মহিষীর অনুপ্রেরণায়ই হেড়ম্ব রাজসভা কবি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি বাংলায় রচনা করেন 'শ্রীনারদি রসামৃত' কবিতা।

রামেন্দ্রবাবু ত্রিপুরায় প্রাপ্ত সপ্তম শতকে লোকনাথ তাম্রপত্রে উল্লিখিত জয়তুঙ্গ বর্ষের উল্লেখ করে বলেন এ জাটিঙ্গা উপত্যকাই জয়তুঙ্গ। নদীটির নামটি হয়তোবা জলতুঙ্গ থেকে সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ায় জয়তুঙ্গ হয়েছে। এ নিয়ে পণ্ডিত গবেষকদের আরও অনুসন্ধান করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ভাষণের শেষ পর্যায়ে রামেন্দ্র দেশমুখ্য কাছাড়ের ভাষা সাহিত্যচর্চাকে একটি সুসঙ্গবদ্ধ রূপ দিতে বঙ্গসাহিত্যের উদ্যোগে একটি 'ভাষা আকাদেমি'

গঠনের প্রস্তাব রেখে আসন গ্রহণ করলে সবাই অনুভব করলেন, এ সম্মেলন কেবল দুদিনের প্রমোদমেলা নয়, এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ক্ষেত্রটি বহুদূর বিস্তৃত। দর্শক আসনে বসা প্রেমেন্দ্রবাবুর মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। কাছাড়ের এ প্রবাসী সন্তান যে তাঁর মনের অনেক অব্যক্ত কথা, দীর্ঘ লালিত অনেক স্বপ্নের কথা অনায়াসে ব্যক্ত করে দিলেন। আমাদের আগামী দিনের পথ তো এই অনুষ্ঠান মঞ্চেই নির্ণীত হয়ে গেল। প্রবোদকুমারের ভাষণ শ্রোতামণ্ডলিকে নানা ভাবে উজ্জীবিত করে তুলল। তাঁর ঋষিতুল্য চেহারা আর উদাত্ত কণ্ঠ মন্ত্রের মতো সারা সভাকক্ষে ধ্বনিত হল।

এরই মধ্যে সুসিতবাবু মঞ্চে উঠে বিনীত ভাবে সম্মেলনের অতি আবশ্যক একটি ঘোষণা করলেন। প্রথা অনুযায়ী প্রতিনিধি সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ এই প্রকাশ্য অধিবেশনে অনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত হতে হতে হবে। তাই তিনি সভাপতির অনুমতি নিয়ে প্রস্তাবগুলো পাঠ করলেন।

একটি একটি করে সাতটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলে তিনি একটু বিরতি নিয়ে বললেন, 'আমাদের সর্বশেষ সাংগঠনিক প্রস্তাবের উপস্থাপক শ্রদ্ধেয় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এবং সমর্থক অধ্যাপক অংশুমান ভট্টাচার্যকে মঞ্চে এসে তাঁদের প্রস্তাব পেশ করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।' শ্রী ভট্টাচার্য লিখিত বয়ান পাঠ করলেন—আগামী এক বৎসরের জন্য সদ্য গঠিত 'কাছাড় বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের' কার্যকরি সমিতির সভাপতি হিসেবে প্রিয়নাথ দেব এবং মেহেরাব আলী লস্কর, দেবব্রত দত্ত, সুসিতকুমার দত্তকে সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হউক।' প্রবল করতালির মধ্যে প্রস্তাবের অপর অংশ পাঠ করার জন্য একটু বিরতি নিয়ে বললেন, 'সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পিত হউক শ্রী প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামীর উপর।' শ্রোতামণ্ডলি প্রবল কলরবের মাধ্যমে সমর্থন জানালেন। ঘোষিত হল দুজন সহ-সম্পাদক, অনন্ত দেব আর জগন্নাথ রায়চৌধুরীর নাম। শ্রোতার আসন থেকে উঠে মঞ্চের একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালেন বিজিৎ চৌধুরী যখন কোষাধ্যক্ষ পদে সুখরঞ্জন চন্দের নাম ঘোষিত হল। বিজয়ীর হাসি হেসে তিনি চারিদিকে তাকালেন। এ নাম যে তিনি প্রস্তুতি সভায়ই প্রস্তাব করে রেখেছিলেন। এবারে অংশুমান ভট্টাচার্য মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি এ প্রস্তাব সর্বান্তকরণে সমর্থন করি।'

রামেন্দ্র দেশমুখ্য এখন আর কবি নয় সভাপতি। তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনারা কাছাড় বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রতিষ্ঠকল্পে মূল প্রস্তাব সহ অপরাপর প্রস্তাবগুলো সর্বান্তকরণে গ্রহণ করছেন কি?' সভাকক্ষ থেকে সম্মতিসূচক ধ্বনি উঠলে তিনি বললেন, 'তা হলে হাততালি দিয়ে প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করুন।'

এবার সুসিতবাবু প্রস্তাবের লিপি এনে অধিবেশন সভাপতির সামনে তুলে ধরলে তিনি বুক পকেট থেকে কলমখানা বের করে সবার অনুমতি নিয়ে নিজ নাম দস্তখত করলে ভাষা শহিদের ভুমির বৌদ্ধিক জগতে শুরু হল এক নতুন অধ্যায়।

১৯

উনিশ শো বাহাত্তরে কাছাড়ের জন্য রাজ্যস্তরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল। পৃথকীকরণের ব্যাপারে ঐক্যমত এল না। সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে কাছাড়ের আর্থসামাজিক জীবন বিপর্যস্ত। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস, বরাকে চরম নৈরাশ্য নৈরাজ্য। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আন্দোলনের ফলে এখানকার ছাত্রদের দু দুটো শিক্ষাবর্ষ গেল নষ্ট হয়ে। ওদিকে বাঙালির উপর লাগল নানা ধরনের তকমা—বহিরাগত বিদেশি, বাংলাদেশি, অনুপ্রবেশকারি। রাজ্যের উজান এবং ভাটি অঞ্চল মুখরিত হচ্ছে জনতার শ্লোগানে শ্লোগানে।

এখানে ওখানে বাঙালির উপর আক্রমণ সংঘটিত হলেও কাছাড়ের জনপ্রতিনিধিদের কোন হেলদোল নেই। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালি ছেলেরা আর যেতে ভরসা পাচ্ছে না। এগ্রিকালচারেল আর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেরও একই অবস্থা। দুলিয়াজানে সর্বজন পরিচিত বৈজ্ঞানিককে উন্মত্ত জনতা প্রকাশ্যে মেরে ফেলল। দেখতে দেখতে গোটা রাজ্যটি চলে গেল আন্দোলনকারিদের হাতে। ছাত্র, শিক্ষক, যুব সমাজ, ব্যবসায়ী, গণমাধ্যমের কর্মী, এমনকী সরকারি আমলাদের মুখেও বহিরাগত বিতাড়নের শ্লোগান। 'জয় আই অহম', 'এ জুই জ্বলিছে জ্বলিব' আর 'উলাই আহা' ধ্বনিতে রাজ্য উত্তাল।

ভুপেন হাজারিকার কণ্ঠে ধ্বনিত হল, 'আজি ব্রহ্মপুত্র হল বহ্নিমান', তিনিও করুণ সুরে গাইলেন ভেতর কাঁপিয়ে দেওয়া গান,

'আই তোক কিহেরে পুজিমে তোক,
আই অ জীয়ন দি পুজিমে তোক,
আই তোর মরমী কোলাতে
আই মই জনমে লভিলো
আই তোক কি হেরে শুজিমে ধার,
আই অ জীয়ন দি শুজিমে ধার।

বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে আগত ছাত্রর কণ্ঠে এ গানটি শুনে প্রেমেন্দ্রমোহনের চোখের জল বাঁধা মানল না। কী অসাধারণ গান বেঁধেছেন ভূপেন হাজারিকা—

আই অ আই
শ্যামলী কোলাতে পাহাড়ে ভৈয়ামে
খেলিল কতনা খেলা,
আই তোর মরমবোর নিগরি
আই অ লুইত হৈ বাগেরে
আই অ শান্তি সাগরলে বুলি
আই অ মহা মিলনলে বুলি...

অনন্ত দেবের প্রিয়পাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ছাত্রকে পেয়েছেন প্রেমেন্দ্রবাবু এক ঘরোয়া আসরে। এ গানটি শুনে তাঁর মনে পড়ে গেছে নিজের হারিয়ে যাওয়া গ্রাম ধর্মদার কথা। সেই পাহাড় সমতল, সেই মায়ের স্নিগ্ধ আঁচল-- এ কথাই তো বলা হয়েছে এ অসমিয়া গীতে। কিন্তু কারা যেন বলে এ গান শুনলে মনের মধ্যে একটা ভয় জাগে।

'এ গানের মধ্যে রয়েছে একটা বিষাদের সুর', বললেন অনন্তবাবু। ইনি ভুপেনদা বলতে অজ্ঞান। -'বুঝলেন, মানুষ মানুষের জন্য গানটি যদি সাতচল্লিশের আগে লেখা হত, কী জানি দেশ বিভাগই বুঝি আটকে যেত।'

'এই একটা ক্লাসিক কথা বলেছেন কাকু। আমিও ভূপেন হাজারিকার ভক্ত, তবে আপনি তো একেবারে অবাস্তব জগতে বিচরণ করছেন।' বলে তর্ক জুড়ে দিল শুভ।

'সেদিনের বাচ্চা, বাস্তব অবাস্তব বোঝার তোমরার আরও বাকি আছে।' শুরু হয়ে গেল তরজা।

গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজে কাছাড়ের ছাত্রের নৃশংস হত্যাকাণ্ড তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। প্রতিবাদী জনতা নেমে এলেন রাজপথে। হিংসার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়তে পথে নেমে গেল এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে। এদের পেছনে দাঁড়ালেন কবি অনুরূপা বিশ্বাস, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, অধ্যাপক বিজিৎ চৌধুরী, আইনজীবী মুজাম্মিল আলী লস্কর, মৃণালকান্তি দত্ত বিশ্বাস, হরিধন পাল। এলেন বাম আন্দোলনের নেতা গৌরাঙ্গ সাহা, তরুণ কবি তপোধীর ভট্টাচার্য। সার্বিক ভাবে সবকিছু সামলে নিতে রয়েছেন অনন্ত দেব। 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই, বিভেদ নয় ঐক্য'—শ্লোগান দিয়ে এ আত্মপ্রকাশ সমগ্র উত্তরপূর্বে অশান্তি, হিংসার বিরুদ্ধে এক প্রত্যাহ্বান। এই হল দিশারীর আত্মপ্রকাশ।

বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী কাছাড়ের সন্তান উত্তর-পূর্ব ভারত পার্বত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ময়নূল হক বড়ভুঁইঞা তৈরি করে দিলেন দিশারীর লগো। জনতার ঐক্যবদ্ধ উত্থিত হাতের আদলে এ লগো ব্যানারে ছাপিয়ে এরা মিছিলে সমাবেশে শান্তি, সম্প্রীতি আর ঐক্যের বার্তা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সদ্য কলেজে ওঠা দেবব্রত চৌধুরী কী এক উন্মাদনায় লিখে নিল গান—

স্বদেশ মোদের মঞ্চ
মোরা ভ্রমর এ মালঞ্চের
গুণগুণ সুরে গাই যে
আজ ব্রাত্যজনের মঞ্চে।

আশি থেকে নব্বইয়ের মধ্যে এ শান্তিযজ্ঞে সামিল হলেন আসামের মেহিনীমোহন চৌধুরী, দেবরঞ্জন ধর, শ্যামাদাস ভট্টাচার্য, দিলীপ শর্মা, নিরূপমা বড়গোঁহাই, প্রতিমা পাণ্ডে, মুকুট শর্মা, নিরূপমা হাগজের, নবকান্ত বরুয়া, সৈয়দ আব্দুল মালিক, বিভু চৌধুরী, ঘনকান্ত ডেকা, নীলপবন বরুয়া, শিবনাথ বর্মন। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী, লেখক-শিল্পী তো আছেনই। দিশারী আয়োজিত 'মৈত্রী উৎসব' মঞ্চ থেকে ধ্বনিত হল শান্তি, সম্প্রীতির বার্তা-- ডিমাসা, মণিপুরি, বহুভাষিক চা শ্রমিকদের সঙ্গে মৈত্রীর সুরে কণ্ঠ মেলালেন অসমিয়া, কার্বি, মিজো এবং বাঙালি শিল্পীরা। বহুভাষিক কবিসম্মেলন, আলোচনা সভা, নৃত্যগীত নিয়ে চারিদিকে অশান্ত পরিবেশের মধ্যে এই আয়োজন। কাছাড়ের তরুণ প্রজন্ম দীক্ষিত হল পঞ্চাশ-ষাট দশকে গণনাট্য সঙ্ঘের গান কবিতা এবং নৃত্যকলায়।

এরা গান গেয়ে মিছিল করতে পারে, সামান্য প্রস্তুতিতে মঞ্চ কিংবা রাস্তায়ই নাটক করতে পারে, স্টেজ বেঁধে অনুষ্ঠান করতেও পারে চটজলদি। অনন্তবাবু শুনিয়েছেন সুরমা ভ্যালি কালচারেল স্কোয়াডের কথা, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নেতৃত্বে কী করে সব প্রতিশ্রুতিবান শিল্পীরা দিনভর শ্রমিক মজদুরের মতো কাজ করে সন্ধ্যাবেলা মঞ্চে ফিটফাট হয়ে হাজির হত এই সব।

'মৈত্রী উৎসবে' এসে আসামের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী নিরূপমা বড়গোঁহাই সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে এ অভিনব, অভাবনীয় প্রতিরোধ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

অনন্তবাবু যেন সেই সুরমা ভ্যালি কালচারেল স্কোয়াডের দিনকে ফিরে আনতে চাইছেন। আমন্ত্রণ করে এনেছেন হেমাঙ্গদাকে। সারা শিলচর উপচে পড়েছে জেলা গ্রন্থাগার মঞ্চে। গণনাট্য সংঘের প্রবীণ সদস্যরা হেমাঙ্গদাকে দেখতে উৎকণ্ঠিত। বিজয় চৌধুরী, গৌরাঙ্গ সাহা, মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য। হেমাঙ্গদা বিমান থেকেই খবর নিলেন তাঁর পরিচিত জনের।

সন্ধ্যায় মঞ্চ আলোকিত করে আছেন দিলীপ শর্মা, প্রতিমা পাণ্ডে, আর হেমাঙ্গ বিশ্বাস। মুহূর্তে ফিরে এল ছয়ের দশকের সেইসব দিন-- বিষ্ণু রাভা, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল, ভূপেন হাজারিকা, ফণী শর্মা, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মঘাই ওঝা, প্রতিমা পাণ্ডে-- এরা হিংসার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক অভিযান চালিয়েছিলেন।

ভাবাবেগে আপ্লুত নিরূপমা বড়গোঁহাই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন শিলচরবাসীকে।

নিজের এককালের কর্মক্ষেত্র কাছাড়ে এসে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের প্রত্যয় হল গণনাট্য আন্দোলনের যেন নবায়ন ঘটছে বরাকের মাটিতে। মানুষ ভুলে গেল ঠিক এরকম সময়েই রাজ্যের আরেকটি উপত্যকায় চলছে হিংসার অনুশীলন।

অনন্তবাবু বিশেষ করে আমন্ত্রণ করে এসেছেন প্রেমেন্দ্রবাবুকে। আজ সন্ধ্যায় হাজির হবেন হবিগঞ্জের সন্তান হেমাঙ্গ বিশ্বাস। সেই হেমাঙ্গ বিশ্বাস যিনি হোলির গানের সুরে বেঁধেছেন গান 'বাঁচব বাঁচব রে আমরা, ভাঙা বুকের পাঁজর দিয়া নয়া ভারত গড়ব।' এই সেই জমিদারনন্দন যাঁর মাউন্টব্যাটন মঙ্গলকাব্য রাজরোষে পড়েছিল। আজও স্মৃতিতে রয়েছে কয়েকটি বেয়াড়া পঙক্তি-'যে বাঁশেতে বাজল রে ভাই স্বরাজের বাঁশরি, সেই বাঁশ যে ডান্ডা হইয়া মাথায় মারল বাড়ি ... মাউন্টব্যাটন সাহেব, তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় গো।'

ধন্য অনন্তবাবু, ধন্য আপনার সাংগঠনিক ক্ষমতা। কী চাঁদের হাট বসিয়েছেন আপনি। আপনার ডাকে এসেছেন আসামের সমস্ত দিকপালরা। গৌহাটি থেকে ডেকে এনেছেন দিলীপ শর্মাকে। ওদিকে তো পরিস্থিতি ভয়াবহ। এদিকের মানুষ অসমিয়া শিল্পীকে কী ভাবে গ্রহণ করবে এটাও চিন্তার।

শ্রোতৃমণ্ডলিকে নমস্কার জানিয়ে রোগা, লম্বা ব্যক্তিটি তাঁর স্নিগ্ধ হাসিতে সবার মন জয় করে ফেলেন। সবার উষ্ণ অভিবাদন পেয়ে ফ্রেঞ্চকাট দাঁড়ির লোকটি হারমোনিয়মের রিডে চাপ দিতেই প্রেক্ষাঘর ভরে উঠল সুরে। হারমোনিয়মের সুরেও এত জাদু! তিনি সুরেলা কণ্ঠে ধরলেন,

মোর ভারত রে, মোর স্বপন রে, চির সুন্দর সংস্কৃতি।
হেউজিয়া বনতে হেউজিয়া মনতে
বিকশি প্রকাশি উঠে নবজন জীয়নরে অভিনব জ্যোতি।

নির্বাক শ্রোতার কানে যেন মধু ঢেলে দিলেন আসামের এ কিন্নর। জ্যোতিপ্রসাদের অনুপম এ গানটি জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগার থেকে ছড়িয়ে পড়ল

বরাকের আকাশে বাতাসে। মুহূর্তে সবাই ভুলে গেল, এ মুহূর্তে আসামে লক্ষ লক্ষ মানুষ গভীর আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

হাতে দুতারা নিয়ে ওয়েস্টকোট পরা হেমাঙ্গ বিশ্বাস যখন ধরলেন গান 'মন কান্দে পদ্মার চরের লাইগ্যা /আমার শান্তির গৃহ, সুখের স্বপন রে/দরদি কে দিল ভাঙিয়া'— প্রেমেন্দ্রবাবুর চোখের জল আর বাঁধ মানল না। এ যে তাঁরই প্রাণের ব্যাথা, প্রাণের কথা-

পানিত কান্দে পানিখাউরি
শুকনাত কান্দে টিয়া
আমার অভাইগ্যার অন্তর কান্দেরে
পোড়া দেশের লাগিয়া।

দরদীরে, আমার আমগাছে ধরেনি মুকুল
আমার ঝিঙা মাচায় ফোটেনি ফুল
আয়নি বকুল তলায়
আউল্যা চুলে সন্ধ্যা নামিয়া
গহীন রাইতে একলা ডালেরে
দুঃখিনী ডাকেনি পাপিয়া।।

তাঁর গানে এল শহিদের কথা, 'আমরা তো ভুলি নাই শহিদ', আর গাইলেন 'হারাধন রঙমন কথা'। এই গান গেয়ে ছয়ের দশকে তিনি আর ভূপেন হাজারিকা সারা আসাম চষে বেরিয়েছিলেন বাঙ্গালখেদা আন্দোলনের দুঃখজনক দিনগুলিতে। প্রেমেন্দ্রমোহন ভাবলেন হারাধনরা আজ কোথায় আছে কে জানে, রঙমনরা জাতীয়তাবাদী ক্যাম্পে যায়নি তো আজও? আসাম আন্দোলনে যে সবকিছুই ওলটপালট করে দিচ্ছে।

প্রেমেন্দ্রবাবু অনন্তবাবুর সাংগঠনিক দক্ষতা দেখেই শুধু তিনি খুশি হলেন না, খুশি হলেন একঝাঁক তরুণ তরুণীকে দেখে। এ ধরনের সংগঠন তো একটা

অঞ্চলের মনোজগৎ গড়ে দিতে পারে। অনন্তবাবু কেমন এতগুলো ছেলেমেয়েদের নিয়ে জারি রাখছেন এ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড।

সন্ধ্যাবেলা তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে (ব্যবসা না ছাই) এসে জমা হয় এরা। দুএকজন চাকুরে হলেও সবাইই ছাত্র, এবং কুড়ির ঘরেই। কয়েকটি অনুষ্ঠান নিয়ে দিশারী সারা উপত্যকায়ই সাড়া ফেলেছে। একটা উৎসব শেষ করে আগামীর প্রস্তুতিই যেন ওদের প্রধান কর্ম। নতুন গান সংগ্রহ, গান তোলা, নাটকের মহড়া, কিছু না হলে দু পাতার একটা ফোল্ডার প্রকাশ। আর যদি কোন কাজ না থাকে অনন্তবাবুর সঙ্গে পলিটিক্যাল ডিবেট।

একবার ডিবেট করে বাড়িতে যেতে না যেতে অনন্তবাবু অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চালান। যাঁর সঙ্গে এই তরজা, সে পরদিন ভয়ে ভয়ে হাসপাতালে গেলে আরেক দৃশ্য। শয্যাশায়ী রোগী ব্যস্ত হয়ে পরিধেয় কাপড় সামলাতে গিয়ে সৃষ্টি করলেন হাস্যকর পরিবেশ। দুর্বিনীত এ তার্কিক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'কাকু আর কত ঢঙ দেখাইতা। আমি তো আপনার স্ট্রোক করাইতেও পারলাম না। চলুন বাড়ি। কাকিমা, দেখি ব্যাগ রেডি করুন।' সবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'এরারে দেখলে মনে হয় আমারে ফাঁসি দেওয়ার লাগি সব রেডি। ধন্য কাকু। আপনার লগে তর্ক করে কোন হালায়।' এই বলে দুই হাত তুলে নমস্কার দিল। তবে তর্ক যাঁর রক্তে সে কি একদিনের প্রতিজ্ঞায় ঝেঁড়ে ফেলতে পারে স্বাভাবিক প্রবণতা। তর্ক এরপরও চলতে থাকে।

অনন্তবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'শোনো, অনেক সময় ছাগল দিয়াও হাল বাওয়ানি যায়।' সবাই বুঝে গেল, তিনি নতুন কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। সত্যিই তাই। সবার উপর ফরমান জারি করলেন, 'তোমরা মৈত্রী, সংহতির উপর গান লিখো। পুরনো গান তো আছেই, সাম্প্রতিক সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রাসঙ্গিক গান চাই আমাদের।' তিনি নিজেই একখানা গান বেঁধে ফেললেন—

ভারতভূমি মোদের জন্মভূমি
বৈচিত্র্যের তুলনা যে নাই
এসো আজি সবে

মৈত্রীর গান গান গাই।

মার্চসং গানের সুরে তালে বেশ হল গানটি। এক ডিমাসা বন্ধু এসে দুটো পঙক্তি অনুবাদ করে দিলে অনন্তবাবুকে আর পায় কে। তিনি নিজেই অনুবাদ করে নিলেন এর দু কলি হিন্দি। তাঁর তার্কিক প্রতিপক্ষ বলল, 'হু! এটা আগে বললে আমিই করে দিতে পারতাম।' এদের জবাব দিতে তিনি আরও একজনকে ধরে গানটির একটি ইংরেজি আর অসমিয়া ভার্সন বানিয়ে নিলে নিন্দুকের মুখ চুন। এখন অবশ্য সবাই মিলেই উচ্চকণ্ঠে গাইতে লাগল—

হাজাই ঠানি জিনি ভারত ঠানি
কাপারি কানে মাইনাঙাহ
পাইভি জিমি কিরিপ জাং
কাসি মুসি রজারনাং।

এবং পর পর হিন্দি, অসমিয়া আর ইংরেজি।

সবাই বিজিৎবাবুর দিকে তাকালে তিনি বললেন --'না, অনন্তবাবুর ক্ষেমতা আছে। কিন্তু অজা দিয়ে হাল বাওয়ানো এতে প্রমাণিত হল না।' যুবকদের দিকে তাকিয়ে বললেন 'অজা বুঝছনি? ছাগল। আমার কোন কবিত্ব নেই। ওই দিকে তাকাও' বলে অনুরূপাদিকে দেখিয়ে দিলেন।

'না, গান লেখার পদ্ধতি অবশ্য কবিতা লেখার পদ্ধতির চাইতে সামান্য আলাদা। দেখি চাইন এই পদে সুর লাগাও তো। সুর অউ আব্দুল গফফার দত্তচৌধুরীর গুয়াগাছো ট্যাক্সো লাগিলনির সুরের মতো, একটু ইদিক সিদিক অইতে পারে'-- বলে ব্যাগ খুলে সদ্য লেখা গানটি বের করে দিলেন অনুরূপাদি। অনন্তবাবু দীপককে হারমোনিয়মে সুর ধরতে বলে নিজেই মোটা গলায় শুরু করলেন, 'বাটার উপরে পড়ল ঠাটা, গাল ভরি পান খাইতায়নি, সজনী গুয়া গাছো ট্যাক্সো লাগিলনি।' বলা বাহুল্য অনন্তবাবুর গলা খুব সুরেলা নয়, কথঞ্চিৎ মোটাও বটে। তবে এ নিয়ে ফিচকেমি শুরু হবার আগেই মোটামুটি আরও একটু মোটাগলায় অনুরূপাদিই গেয়ে উঠলেন—'পাকর ঘরো লাগল আগুন থাল ভইরা ভাত খাইতায়নি, সজনী, এমন পোড়া কপাল আগে জানতাম নি।' বিজিৎবাবু বলে উঠলেন 'এইটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। টেপ রেকর্ডারে ধরিয়া রাখলে

ভ্যালুয়েবল রেকর্ড হইতে পারত। ধন্য দিদি আপনারে।' দিদি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'আমরা মাঠে ময়দানে গান গাওয়া মানুষ, এরার মতো কি আর গলার মাধুর্য আছেনি।'

২০

ওদিকে ছাত্র সংগঠনের চাপে একের পর এক অস্থায়ী সরকার রাজ্যের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বার্থের পরিপন্থী পদক্ষেপ নিয়েই চলেছেন। এ অবকাশে কাছাড় হয়ে উঠেছে দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য। কে এর প্রতিবাদ করবে? ওদিকে আবার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মুখ থেকে বেরিয়েছে একটি প্রশংসাবাক্য, কাছাড় নাকি একটি 'শান্তির দ্বীপ'। শুনে সচেতন মানুষ মুচকি হাসেন। কোন প্রতিবাদ নেই, রাজনৈতিক প্রতিরোধ নেই, উন্নয়নের কোন প্রচেষ্টা নেই, এত প্রশংসার বোঝা মাথায় নিয়ে কী হবে! আন্দোলন ধামাচাপা দিলেও বরাক উপত্যকার কর্মপ্রার্থীরা ওদিকে গেলে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসছ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গিয়ে ছাত্ররা হচ্ছে নানা ধরনের হেনস্তার শিকার, আর হোস্টেলে গেলে তো প্রাণ সংশয়।

এদিকে শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে সংশয়ের অবধি নেই। বাংলা পাঠ্যপুস্তকগুলোর অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। প্রেমেন্দ্রবাবু শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতি এবং বঙ্গসাহিত্যের পক্ষ থেকে এ নিয়ে শিক্ষাপর্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বরাকের ছাত্ররা তো বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলনের নামে স্কুল কলেজ বন্ধ করেনি। শিক্ষার পরিবেশ স্বাভাবিক থাকলেও একটি বছর হল ওদের পরীক্ষাই হল না। বইপত্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন ছাত্রসমাজ দিন কাটাচ্ছে কেমন নৈরাজ্যের মধ্যে।

পাঠ্যপুস্তকগুলোর যা অবস্থা, এগুলো দিয়ে ছাত্রদের মনোযোগ আর কত আকর্ষণ করা যায়? সুযোগ্য শিক্ষাবিদ লেখকদের দিয়ে বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়ে নেবার দাবিতে কেউ কান দিচ্ছেন না। সঙ্গত কারণেই অনেকদিন থেকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুদ্রিত বই আমদানি বন্ধ। কিন্তু আসামে প্রতি শিক্ষাবর্ষে যে প্রাথমিক স্তর থেকে স্নাতক স্তর অবধি ন্যূনতম ১০০টি বাংলা বইয়ের প্রয়োজন। এর উপযুক্ত পরিকাঠামো না তৈরি করে আসমিয়া বই থেকে সরাসরি অনুবাদ

করিয়ে নেওয়ার প্রথা চালু হয়েছে। অনূদিত পাঠ্যপুস্তক যে একটা অবাস্তব অলীক বিষয় এটা কা'কে বোঝান যায়? যে-বিষয়টি শিক্ষাবিদদের পীড়িত করছে তা হল, অনূদিত ভাষা শিক্ষার বই। মাস্টারমশাইরা দুঃখের সঙ্গে বলেন, পৃথিবীতে একমাত্র আসামেই অনূদিত প্রাইমার দিয়ে পাঠশালায় পাঠদান হয়। গান্ধী শান্তিপ্রতিষ্ঠানে মহীতোষবাবুর উপস্থিতিতে শিক্ষকদের নিয়ে এ বিষয়ে একটি আলোচনায় বসেছেন প্রেমেন্দ্রবাবু।

একজন বললেন, 'অ, আ, ক, খ বই প্রথমে অসমিয়া ভাষায় লিখিত হবে, এরপর একজন অনুবাদককে দিয়ে এটাকে বাংলা করিয়ে নেওয়া! শিক্ষা নিয়ে এ ছেলে খেলা নয় কি?'

'মানলাম তাই হল, কিন্তু ছড়াগুলোর কী হবে? অসমিয়া ছড়া, তা আবার ঐ বর্ণমালার উপর--এগুলোর কী হবে। অনুবাদক একজন বিরাট প্রতিভাবান কবি হলেও এটা কী গ্রহণযোগ্য?'

এ নিয়ে গৌহাটিতে শিক্ষাপর্যদের কার্যালয়ে একটি বৈঠকে বসেছেন বঙ্গসাহিত্যের কর্মকর্তারা। সভাপতি প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামীর নেতৃত্বে আলোচনায় উপস্থিত প্রাক্তন সাংসদ নৃপতিরঞ্জন চৌধুরীও। তাঁর মুখের কোন রাখঢাক নেই। কিছুদিন আগে তিনি গিয়েছিলেন শিলচরে আকাশবাণীর কেন্দ্র অধিকর্তার কাছে অনুরূপ সিরিয়াস এক অভিযোগ নিয়ে। ইনি নাকি লোকসংগীতের ভাষা শুদ্ধ করার কাজে লেগেছেন।

অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'রেডিওতে প্রচারিত লোকগানের অনুষ্ঠান যে এ কেন্দ্রের সব চাইতে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান তা তো জানেনেই।' ডিরেক্টর মশাই মাথা নাড়লেন।

'তবে মাঝে মাঝে কিছু অতি পরিচিত গানের পদের বিকৃতি কানকে নিরতিশয় পীড়িত করে।'

'বুঝলাম না। কী ব্যাপার বলুন তো?'

'আমার অভিযোগ গানগুলোর মধ্যে নির্মমভাবে কাঁচি চালানো হয়'। ভদ্রলোক একটু বিব্রত হলেন। নৃপতিবাবু রাধারমণের গানের উপর রেড

টেপিজপমের কথা বললেন। তিনি উত্তর দিলেন, 'মিডিয়াতে প্রচারের ক্ষেত্রে সব ধরনের শ্রোতার প্রতি নজর দিতে হয়। কিছু কিছু প্রাচীন ফোক টার্মসকে সামান্য এডিট করতে হয়, আফটার অল, ম্যান ডু নট স্পিক দ্যা লেঙ্গুয়েজ অব ইয়েসটারডে। তবে বি এসিয়র্ড, ট্র্যান্সমিশনে যাবার আগে আমি নিজেও সবকিছু দেখে নিই।'

'দেখুন, আমাদের এ অঞ্চলের অন্যতম পদকর্তা হচ্ছেন রাধারমণ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাধারমণের গান তো আমরা প্রচার করি।'

'তা তো ঠিকই আছে, কিন্তু এ গানের ভনিতায় যে ব্যুরোক্রেটিক ইন্টারফেয়ারেন্স চলছে।'

ডিরেক্টর মহোদয় কিছু বুঝতে পারছেন না।

"বলছি আকাশবাণী তো রাধারমণকে পাঁঠা বানিয়ে দিয়েছে। বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করুন। একদিন হলে কোন ব্যাপার ছিল না, কিন্তু এইসব যে বার বার হচ্ছে। গানের মূল পদে আছে 'ভাইবে রাধারমণ বলে'। এখানে 'ভাইবে'র জায়গায় 'ভেবে' করলে তো আমরা তো বিপন্ন। জানেন তো আমাদের কাছাড়ে বলির পাঁঠা এইরকম 'ভ্যা ভ্যা' করে ডাকে।"

ওদিকে প্রেমেন্দ্রবাবু যে নৃপতি চৌধুরীকেও নিয়ে যাচ্ছেন গৌহাটিতে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদে। অনুবাদ নিয়ে কথা উঠলে তিনি বলে উঠলেন, "আপনারা এমন সব লোককে অনুবাদের কাজে লাগান, যারা বিড়ালকে মেকুর বলে জানেন। এর যে একটা তৎসম প্রতিশব্দ আছে 'মার্জার' এরকম শব্দ এরা শুনেনেই নি।' কথাটি বললেন একেবারে চেয়ারম্যানের দিকে সরাসরি তাকিয়ে। মহিলা সেক্রেটারি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বললেন, মেকুরি?' শব্দটি ওঁর কানে পৌঁছেছে, কিন্তু প্রাসঙ্গিকতা ধরতে পারছেন না।

নৃপতিবাবু বলে চলছেন, 'অসমিয়া ভাষায় রচিত প্রাইমারে অসমিয়া জাতির ভাষা, সংস্কৃতি এবং জাতীয় জীবনের একটা প্রতিচ্ছবি থাকবে। এই জিনিসটি ভিন্ন ভাষায়, ভিন্নতর ভাষিকগোষ্ঠীর কাছে প্রাসঙ্গিক হবে কী করে? তাও আবার অনূদিত হয়ে।' চেয়ারম্যানকে চিন্তিত দেখে নৃপতিবাবু একটু

মোলায়েম করে বললেন, 'এই যেমন ধরুন বাংলা প্রাইমারে আছে—অজগরটি আসছে তেড়ে/আমটি আমি খাব পেড়ে/ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে/ঈগলপাখি পাছে ধরে।' এই ছড়াটি কি অসমিয়া বা হিন্দিতে অনুবাদ করলে চলবে? শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় এরকম বই কি দেওয়া যায়?" আলোচনাটি যদিও প্রাইমার নিয়ে নয়, তবুও অনূদিত পাঠ্যপুস্তকের অবাস্তবতা দেখাতে নৃপতিবাবু বলেই চলেছেন, 'শুনুন, আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা দৃশ্য, বর্ণ, ছন্দ, ফুল, জল, পল্লব, পাখপাখালি, গাছগাছালি—ব্যাকরণে যাকে বলে বিশেষ্য, এ সব কিছুর সঙ্গেই প্রাথমিক পরিচয়ের মাধ্যম এই বর্ণপরিচয় বা ফার্স্টবুক অর্থাৎ প্রাইমার। এইটা অনুবাদক দিয়ে করিয়ে নেওয়া তো সোনার পাথর বাটি বা কাঠাঁলের আমসত্ব তৈরি করারই নামান্তর।'

রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য এ বাকসিদ্ধ এমপি নৃপতিবাবুর কাছে সুজিৎ চৌধুরীর মত ব্যক্তিও সচরাচয় পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন, সেখানে আসাম সরকারের উচ্চপদস্ত আমলা আর কতদূর এগোতে পারেন? প্রেমেন্দ্রবাবুর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝলেন আলোচনা গুটিয়ে নিতে হবে। তিনি বললেন, 'মাননীয় চেয়ারম্যান স্যারকে বলি, এ রাজ্যে যদি অসমিয়া প্রাইমারও ইংরেজি, বাংলা বা অন্য কোন ভাষা থেকে অনুবাদ করার প্রয়োজন দেখা দেয় বা এরকম প্রয়াসের দুর্মতি আমাদের হয়, এটাও প্রতিহত করা হবে আমাদের কর্তব্য।'

বঙ্গসাহিত্যের প্রতিনিধিদল পর্ষদকে অঙ্গীকার করে এসেছেন, রাজ্যসরকারের পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত যে কোন প্রয়াসে তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা থাকবে। কথা তো দিয়ে এলেন, কিন্তু বরাক উপত্যকায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ণে দক্ষতা আছে, বা এ নিয়ে নিরন্তর চর্চা, গবেষণা আছে এরকম ব্যক্তি যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবে এসব তো আর একদিনে তৈরি হয় না। এ জন্য যা প্রয়োজন তা হল শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বিপ্লব। এ বিপ্লব আসতে পারে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে।

না, না, আর দেরি নয়। এবার এদিকে নজর দিতে হবে।

২১

বাহাত্তরে রাজ্যস্তরের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব নাকচ হয়ে যাওয়ার পরও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থা এ নিয়ে দাবি করে আসছেন। বিধানসভা এবং কেন্দ্রীয় সংসদে এ নিয়ে মৃদু দাবিও উঠছে। দাবি উঠছে বিভিন্ন শিল্প-সাহিত্য সংগঠনের পক্ষ থেকেও। এ দাবিটি অবশ্য কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের, যদিও এর চরিত্রলক্ষণ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা সম্বন্ধে তেমন কোন ধারণাও কারও নেই। প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামী একদিকে বঙ্গসাহিত্য অপরদিকে শিক্ষাসংরক্ষণ সমিতি দুইটি সংগঠনেই এ নিয়ে চিন্তাচর্চা শুরু করলেন।

শুধু দাবি উত্থাপনই যথেষ্ট নয় এটা অনুভব করে একটি গণ অভিবর্তন আহ্বান করলেন শিক্ষাসংরক্ষণ সমিতির পক্ষ থেকে। বিশ্ববিদ্যালয় যাতে যথার্থ রূপেই একটি বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে এ নিয়ে উপত্যকার শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, কবি সাহিত্যিক, সচেতন নাগরিকের সমবেত চিন্তার ফলশ্রুতি হল একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নিয়ে বিস্তর আলোচনায় এটাই স্থির হল, কোন স্থান বা কোন জাতি বা উপজাতির নামের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে এ নামকরণে যেন একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় থাকে। অনেক বিবেচনার পর স্থির হয় বিশ্ববিদ্যালয়টি হোক 'পূর্ব ভারত বিশ্ববিদ্যালয়'। এর পরিধিও যেন একটি মাত্র জেলাতে সীমাবদ্ধ না রাখা হয়।

শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে অতীতে যে সব অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে গেছে এ রাজ্য, এর সম্ভাবনা সমূলে বিনষ্ট করতে প্রস্তাব রাখা হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরেজি, এবং এর সঙ্গে বাংলা, হিন্দি, মণিপুরি, ডিমাসা, নেপালি, বড়ো এবং অবশ্যই অসমিয়া ভাষার সংস্থানও রাখা হবে। অভিবর্তনে এক সুরেই এ কথাটি উচ্চারিত হয়েছে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ভাষাভাষীর প্রতি যেন কোনও বৈষম্য না থাকে। উনিশে মে'র শহিদের প্রতি সম্মান জানিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন প্রতিটি ভাষিক গোষ্ঠীর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে।

পাঠক্রম রচনায়, প্রাগ্রসর গবেষণায় এবং শিক্ষক নিয়োগ সবকিছুই যেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সমতারক্ষা করেই হয়, এখানে যেন অঞ্চলিকতা প্রশ্রয় না পায় এ দিকেও ঐক্যমত্য হয়। সর্বোপরি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে

যাতে কোন ভাবেই উগ্রজাতীয়তাবাদ প্রশ্রয় না পায় এ দিকেও যত্নবান হবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হিতেশ্বর সইকিয়া শিলচর এলেন ৮৩ সালের শেষের দিকে। প্রেমেন্দ্রবাবুর নেতৃত্বে শিক্ষসংরক্ষণ সমিতি একটি স্মারকলিপি তাঁর হাতে তুলে দিলেন—এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবির সঙ্গে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখাও তুলে ধরা হল। সম্পাদক শ্রী গোস্বামী ছাড়াও এতে দস্তখত করলেন অধ্যাপক জগন্নাথ রায়চৌধুরী এবং তাজ উদ্দিন বড়ভুইঞাঁ। এত সুলিখিত সুচিন্তিত স্মারকপত্র দেখে মুখ্যমন্ত্রী অভিভূত। বিষয়টি নিয়ে দিন কতক খুব চর্চা হল। কিন্তু রাজ্য বিধানসভায় এ নিয়ে তেমন কোন কথা হল না।

ইতিমধ্যে সন্তোষমোহন দেব নির্বাচিত হয়ে গেলেন লোকসভায়। দীর্ঘ দুই বৎসর তিনি তেমন কিছুই করতে পারলেন না, মাঝে মাঝে দু একটা টিপ্পনি কাটা ছাড়া। এটা ছিল তাঁর প্রস্তুতি পর্বও বটে। একদিন সদনে জনৈক সাংসদকে ঘুমোতে দেখে সন্তোষবাবু উঠে স্পিকার বলরাম জাকরকে প্রশ্ন করে বসলেন, 'ক্যান আ ম্যান স্লিপ ইন পার্লামেন্ট?' সবাই ভাবছিলেন আসামের কোন বিষয় উঠছে। ওদিকে বলরাম জাকর সরাসরি উত্তর দিলেন, 'ইয়েস, ওয়ান ক্যান স্লিপ, বাট ক্যান নট স্নোর'। সদনে উঠল হাসির রোল। এরই মধ্যে এ নিয়ে স্টেটসম্যান কাগজে একটি সম্পাদকীয় হয়ে যাওয়াতে বিষয়টি জাতীয় স্তরে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে গেলে বরাক উপত্যকায় কতিপয় দুর্বিনীত বুদ্ধিজীবী টিপ্পনি কাটলেন, 'আমাদের নেতার নাম যে সংসদীয় ইতিহাসে এই নাক ডাকার জন্য বিখ্যাত হয়ে গেল।' না তিনি ঘুমোলেন, না ডাকালেন নাক, শুধু বদনামের ভাগী হলেন। এমন সময়ই শিক্ষাসংরক্ষণ সমিতির কাগজপত্র হাতে পড়লে তিনি নড়ে বসলেন, ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর তাঁর মাথায় আসতে থাকল। তবে জল ইতিমধ্যে অনেক দূর গড়িয়ে গেছে।

সিদ্ধান্ত হল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সকাশে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি পেশ করা হবে। বরাক উপত্যকার ইতিহাস, জনবিন্যাস, ভাষিক অবস্থান সমস্ত কিছুর বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত এ দাবিপত্রে উত্তরপূর্বের অশান্ত পরিবেশের মধ্যেও বরাক উপত্যকার শান্ত পরিবেশের কথা সহ দক্ষিণ

আসামের শিক্ষা জগতের নৈরাজ্য, ছাত্রছাত্রীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, আসামের মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যদ, এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভাষিক সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য, এবং মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিরাপত্তাহীনতার কথাও বর্ণিত হল।

আইনজীবী আব্দুল বাছিত চৌধুরি, অসিতবরণ চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ বিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অমলেন্দু ভট্টাচার্য, ছাত্রনেতা রমাবিজয় দেব সহ নয়জন সদস্যের এক প্রতিনিধিদল প্রেমেন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে নয়াদিল্লিতে পৌঁছোলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত রূপরেখা, বরাক উপত্যকা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাস, জনবিন্যাস, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সমাজ, অর্থনীতি এবং শিক্ষাচিত্র সম্পর্কিত সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য একেবারে হাতের মুঠিতে এনে ফাইলপত্র নিয়ে নতুন দিল্লিতে পা দিয়ে প্রেমেন্দ্রবাবু যেন ফিরে গেলেন অতীতে। সুন্দর করে সাজানো দিল্লি নগরী। রাস্তাগুলোর নামকরণের মধ্যে রয়েছে এত ইতিহাস—প্রাচীন এবং নিকট অতীতের সাযুজ্য। এশিয়ান গেমস পরবর্তী দিনের দিল্লির চেহারার সঙ্গে আগেকার চেহারার বিস্তর তফাৎ। মোঘল শৈলীর মৌল কাঠামো বজায় রেখে আধুনিক শৈলীর যে সার্থক প্রয়োগ করে গেছেন ব্রিটিশ স্থপতি স্যার এডুইন ল্যান্ডসের ল্যুটনস, এর মধ্যে স্বাধীনতা পরবর্তী সংযোজন বিশেষ করে চোখে পড়ার মত। সুপরিকল্পিত নগরীটি আগস্ট মাসের দাবদাহে কেমন ঝলমল করছে। রাস্তার নামকরণ, এখানে ওখানে দেশবরণ্য মনীষীদের মর্মর মূর্তি যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেই স্বাধীনতার দিনের ইতিহাসে। মহাত্মা গান্ধী মার্গ, তিলক মার্গ, কস্তুরবা মার্গ, আবুল কালাম আজাদ রোড, সর্দার প্যাটেল মার্গ, জহরলাল নেহেরু রোড, আকবর রোড, অরুণা আসফ আলী মার্গ, দারা শিকো রোড, বাহাদুর শা জাফর রোড, সাজাহান রোড, মহর্ষি রমণ মার্গ, সফদরজং রোড, নেতাজি সুভাষ মার্গ, রাণী ঝাঁসি মার্গ, চিত্তরঞ্জন পার্ক, শ্রী অরবিন্দ মার্গ—এ তো জীবন্ত ইতিহাস গ্রন্থ।

অল্প অবকাশে একটি গাড়িতে বিকেল বেলা দিল্লি নগরি পরিক্রমা করতে করতে পৌঁছে গেলেন ইন্ডিয়া গেটে। বিশ্বযুদ্ধে ৭০০০০ ভারতীয় শহিদ জোওয়ানের মধ্যে ১৩৫১৬ জন অমর শহিদের খোদিত নাম দেখে প্রেমেন্দ্রবাবুর

মনে হল, কী জানি আমাদের অঞ্চলের কারো নাম আছে কি? বন্ধুবর জ্যোতির্ময় সেন বলেছেন কাছাড়-করিমগঞ্জে কয়েকশো বিদ্রোহী সিপাহিদের রক্তে ভিজেছে আমাদের এ মাটি সেই ১৮৫৭-৫৮ সালে। এদের নামও তো এরকম স্থানে থাকা উচিত। ঠিক আছে বিশ্ববিদ্যালয়টা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক, সিলেট-কাছাড়-মণিপুর সহ দক্ষিণ আসামে সংঘটিত স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসও রচিত হবে এ আমাদের এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে, নিশ্চয়ই জনসমক্ষে আসবে সেই সব সংগ্রামী শহিদের পরিচিতি। দেশভাগের পর আসাম রাজ্যে আশ্রয়প্রাপ্ত বাঙালিদের নাগরিকত্ব নিয়ে যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন এদের যথাযোগ্য উত্তরই হল এ অঞ্চলের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস। যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়, আমার স্থির বিশ্বাস আমাদের যে সব সন্তানরা এতে গবেষণা করবেন এরা এই মাতৃঋণ শোধ করবেনই। যে কাজ শুরু করেছেন আমাদের মনীষীরা এটা এবার এগিয়ে যাবে। আগামীকাল এরকম সময়ই বোঝা যাবে তাঁদের কথা ঠিক মতো সঠিক জায়গায় পৌঁছোছে কি না। এ ভাবনা মাথায় আসতেই মনে হল এক্ষুণি ফিরে যেতে হবে হোটেলে। আপাতত চাই বিশ্রাম, আগামীকালের প্রস্তুতি।

প্রেমেন্দ্রমোহন তো আজ পর্যটক নন, এসেছেন স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে উত্তর-পূর্ব ভারতের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে। কোনও রাজনৈতিক দাবি নয়, শিক্ষা বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি। যে-স্বাধীনতা আন্দোলনের উন্মাদনায় একদিন মিছিলে নেমেছিলেন, সেই অর্জিত স্বাধীন দেশের রাজধানীতে এসেছেন ন্যায্য অধিকার চাইতে, যে-অধিকার বার বার ছিনিয়ে নিতে উদ্যত ওঁরা, যাদের সঙ্গে একটা সময় আমরাও হাতে হাত মিলিয়ে আন্দোলন করেছি, কারগারে নির্যাতন সহ্য করেছি।

দিল্লি যাত্রার প্রাক-কালে প্রেমেন্দ্রমোহন এবং তাঁর সঙ্গীদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হয়েছে। একটা কনসেপ্ট নোট তৈরি করা যে এত শ্রমসাধ্য, তা কি কেউ বিশ্বাস করবে?

যে বিশ্ববিদালয়ে দাবি নিয়ে যাচ্ছেন এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে তবে তো সূচনাতেই বিপত্তি। শুধু আবেগ দিয়ে তো এসব হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনি দিক সহ অপরাপর সব দিকই দেখতে হয়। দেখতে হয় ইউজি সি রুলস এন্ড রেগুলেশনস, অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা, কর্মপদ্ধতি।

সময়টি যে বড় অবিশ্বাসের। নইলে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত শিক্ষাবিদ, শিক্ষা আধিকারিকদের পরামর্শ পাওয়া যেত। আসাম আন্দোলন যে শিক্ষক সমাজেও একটা মানবিক ক্ষত সৃষ্টি করেছে। শিলচরে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়েরে তৎপরতা ওদিকে কোন ঔৎসূক্য জাগানোর পরিবর্তে সৃষ্টি করছে অসূয়া। অনেকে প্রকাশ্যেই বলছেন, এটা গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত। কেউ কেউ বলছেন, এখানে উগ্র বাঙালিয়ানার চাষ হবে। রাজধানীর কাগজে এ নিয়ে অবিরত কুৎসা চলছে। দুঃখের কথা বরাক উপত্যকায় উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যাঁরা জড়িত, এদের তেমন কোন হেলদোল নেই।

উৎসাহ যত, সবই ইশকুল টিচারদের। এরা চাকরি হারানোর ভয়কে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে আন্দোলনে মত্ত হননি শুধু, এদের অনেকে আন্দোলনে গিয়ে জেলও খেটে এসেছেন। সেটা বাহাত্তরে। এই স্কুল টিচারদের কারোই চাকুরি কনফার্মও হয়নি তখন পর্যন্ত। এরা জানতেন না এরা যে-ইউনিয়ন করছেন সেটা সরকারি স্বীকৃত ইউনিয়ন কি না। দিলীপ দে, দুর্গেশ দাসপুরকায়স্থ, পলু বিশ্বাস আর এদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন ছাত্রনেতাকে পুলিশ জেলে আটকে রেখেছে। বাইরে প্রবল প্রতিবাদের চোটে গাড়িতে উঠিয়ে এদের চালান করে দেওয়া হল গৌহাটি সেন্ট্র্যাল জেলে। মাটিতে শুয়ে নিত্য নুতন পরিকল্পনা আর চার্জশিটের প্রতীক্ষায় দিন কাটছে। এদের সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন ছাত্রনেতাও-- স্বদেশ বিশ্বাস, দয়ার্দ্র পালচৌধুরী, হাইলাকান্দির নজমুল হোসেন মজুমদার, শিলচরের শঙ্কর রায়চৌধুরী। অবশেষে চার্জশিট এল। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম বিষয়ক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাছাড়ের গ্রামে গঞ্জে গিয়ে গিয়ে উস্কানি প্রদানের অভিযোগে অভিযুক্ত দিলীপকুমার দে কাগজটি হাতে পেয়েই উত্তর লিখতে বসলেন। বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানি প্রসঙ্গে লিখলেন, 'এ অভিযোগ আংশিক সত্য। আমরা অপপ্রচার নয় জন সচেতনতা করতে গিয়েছি। বিষয়টি রাজনৈতিক নয় একাডেমিক'। তিনি Education Policy 1968 এর উল্লেখ করে লিখলেন, 'একাডেমিক বিষয়ে মত প্রকাশ করার অধিকার এ পলিসিতে ঘোষিত হয়েছে। আমরা একাডেমিক বিষয় নিয়ে জনতার কাছে গেছি, সরকারের পছন্দ হয়নি, সে অন্য কথা।'

সদ্য ওকালতি পাশ করা মনীন্দ্র সিং এসব দেখে বলল, "বুঝলাম, তোমরার ইচ্ছা আরও অনেক দিন জেলে থাকার। ইস, পাগল হকল। আমি ডিকটেইট করি, লিখো রে, these are baseless, fabricated and unfounded allegations, লিখো I am not a threat against the country- উকিলর বুদ্ধি থুরা নেওরে, ইংরেজির মাস্টরির জায়গা ইটা নায়।"

খসড়াটি হাতে নিয়ে মনীন্দ্র তো হেসে খুন, 'কী সব লিখছ তোমরা-- তিনটা নয় আরও অনেক গ্রামেই আমরা গেছি। --ভালো, খুব ভালো। সঙ্গে গ্রামের নামও দিলে না কেনে, মামলা সাজাইতে পুলিশের সুবিধা হইত।'

পনেরো বছরে অবশ্য এরা আরও সেয়ানা হয়েছেন, সরকারের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা করে চাকরিতে পুনর্বহাল হয়েও শিক্ষক আন্দোলনে সক্রিয় রয়েছেন। সময়টা যে ছিল এই রকম। এরা প্রথমে শিক্ষক সমন্বয় সমিতি এবং অতঃপর প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামীর নেতৃত্বে শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতির কাজে জড়িয়ে পড়লেন।

প্রেমেন্দ্রবাবুর মাথায় কাজের বোঝা। প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপনের জন্য দাবিপত্রে এ অঞ্চলটির ইতিহাস, ভূগোল, জনতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব সমস্তকিছুই থাকতে হবে। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি, প্রকৃতি, প্রাগ্রসর গবেষণার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা, সর্বজনগ্রাহ্য একটা নামকরণ—এ নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করে একটি খসড়া খাড়া করা চাট্টিখানি কথা নয়।

দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে সমস্ত কাগজপত্র ফাইলবন্দি করে রেল গাড়িতে উঠলে মনে হল যুদ্ধের প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করা হয়ে গেছে। এ তিনটি দিন কেবল বিশ্রাম, ছুটি আর ছুটি। এখন জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা, আর রেলের দোলায় ঝিমোনো। চোখের সামনে কেবলই দৃশ্যপট বদলে যাওয়া। শান্ত, স্নিগ্ধ, সবুজ নিসর্গ ক্রমে পাল্টে হয়ে যাচ্ছে রুক্ষ, শুষ্ক।

রেলের কামরায় অল্প বয়স্করা একদিকে আর প্রেমেন্দ্রবাবুরা আরেক দিকে একটা কুপে। তাঁর সঙ্গে আছেন আব্দুল বাসিত চৌধুরী আর অসিতবরণ। একদিকে বিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য গাড়িতে উঠেই একটি ইংরেজি নোভেল নিয়ে বুঁদ।

স্টেশনে স্টেশনে পাকা পেঁপে, শসা এসব কেনা হচ্ছে, আর মাঝে মাঝে চা, পান তো আছেই।

প্রেমেন্দ্রবাবু বলছেন, 'আমার জন্য তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। দুপুর বেলা তোমাদের সঙ্গে যা হোক দুট ডাল ভাত হলেই আমার চলে যাবে।'

ছাত্র অমলেন্দু মাঝে মাঝে পান নিয়ে আসে স্যারের জন্য। ইদানীং লোকসংস্কৃতি নিয়ে গবেষণার কাজে নেমে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে পান চিবোনোটা ওঁর ভালোই রপ্ত হয়েছে।

ভেতরে বাইরে প্রচণ্ড গরম, তবে এতে কারোই তেমন ভাবান্তর নেই। পাটনা স্টেশনে গাড়ি থামলেই প্রেমেন্দ্রবাবু ছুটে গিয়ে কয়েক মগ কলের জল মাথায় ঢেলে নিলেন। কাঁধের গামছাটা জলে ভিজিয়ে গা'টাও ভালো করে মুছে নিয়ে পরিষ্কার একখানা পাঞ্জাবি গায়ে গলিয়ে বললেন, 'এখন দেখো কী দিয়ে দুপুরের পর্বটি সমাধা হয়'।

আসিতবরণের ব্যবস্থা পাকা। ক্যাটারিং থেকে গরম গরম ভাত আর ডাল সবজি এল।

২২

আজ ২ আগস্ট, ১৯৮৪। কেন্দ্রীয় সংসদ চত্তর। শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতির হাতে ছয় পৃষ্ঠার মেমোরেন্ডাম দেখে জনৈক উচ্চপদস্ত আমলা বললেন, 'প্রধানমন্ত্রীর তো এত বড় কাগজ পড়ার সময় হবে না। ওটা আপনারা জমা করে দেবেন, কিন্তু সঙ্গে একটা আলাদা কাগজে আপনাদের সিনপসিস অর্থাৎ মূল কথাটি পারলে একটি বাক্যেই লিখে দিন। যথাসময়ে ওই পূর্ণাঙ্গ দলিলটি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে খতিয়ে দেখা হবে।'

'জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা, যতই ধুলায় তারে করো অবহেলা'— প্রেমেন্দ্রমোহন সারাটা জীবন ছাত্র পড়িয়েছেন। ইংরেজি প্রেসি রাইটিং শেখাতে তাঁকে কত না গলদঘর্ম হতে হয়েছে। আজ সেই বিদ্যার অগ্নিপরীক্ষা। তিনি কলম হাতে নিয়ে ফস ফস করে মাত্র পঞ্চাশটি শব্দে একটি সিনপসিস লিখে নিলেন।

মনে মনে উচ্চারণ করলেন হ্যামলেটের সেই উক্তি, 'ব্রেভিটি ইস দ্যা সোল অব উইট।'

সংসদ ভবনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে যৌবনে তাঁর স্বপ্নের নেতা পণ্ডিত নেহেরুর সুযোগ্যা কন্যার দরবারে যাওয়াটা একটা ভিন্নতর অনুভূতি জাগিয়ে তুলল। সংসদ ভবনে মহাত্মা গান্ধীর বিশাল মর্মর মূর্তির সামনে এক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন প্রেমেন্দ্রমোহন। কাছেই রয়েছে পার্লামেন্টের সেন্ট্রেল হল যেখান থেকে স্বাধীনতার মধ্যরাতে নেহেরুজির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল ভাষণ, 'Tryst with destiny'।

সাউথ ব্লকে প্রধানমন্ত্রীর কক্ষে ঢুকতেই প্রেমেন্দ্রমোহন একেবারে ভিন্ন মানুষ। এখন আর কোন ভাবাবেগ নেই মনে। সাদা ধূতি-পাঞ্জাবি পরিহিত চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা, অধ্যক্ষ প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামীর মুখে স্মিত হাসি। তিনি হাতজোড় করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অভিবাদন করে দলের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রধানমন্ত্রীও হাসি মুখে সবাইকে স্বাগত জানালেন, এবং তাঁদের বক্তব্য শোনার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন—'ইয়েস, প্লিজ'।

একদিকে বসেছেন শিলচরের এমপি সন্তোষমোহন দেব, উচ্চপদস্থ আমলা, আর এদিকে তাঁর পাশে শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতির সহ-সভাপতি আব্দুল বাসিত সাহেব, এবং এরপর অসিতবরণ চৌধুরী, বিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, জয়নাথ রায়, সুশান্ত পাল, অমলেন্দু ভট্টাচার্য এবং দু'জন ছাত্র প্রতিনিধি রণবিজয় দেব আর নিবাসরঞ্জন দেব।

প্রেমেন্দ্রমোহন ইংরেজিতে শুরু করলেন, "উইথ কমপ্লিমেন্টস এন্ড ওয়ার্ম গ্রিটিংস ফ্রম টুয়েন্টি লাখস অব পিপল অব বরাক ভ্যালি', বলে একটু থেমে বললেন, 'রেফার্ড টু এজ এন আইল্যান্ড অব পিস বাই আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার ম্যাডাম।'

ইন্দিরা গান্ধীর মুখে হাসি। প্রেমেন্দ্রবাবু হাতের ফাইলটা খুলে মুদ্রিত স্মারকপত্রটি বের করে সামনে মেলে ধরলেন, 'উইথ ইয়োর কাইন্ড পারমিশন, আমি খুব সংক্ষেপে আমাদের মূল কথাটি আপনার সামনে তুলে ধরব।'

প্রধানমন্ত্রী আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি শুরু করলেন,

'মহোদয়া, দীর্ঘদিন ধরে আসামের বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলন এবং একই সঙ্গে রাজ্য শিক্ষাপর্যদ এবং দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষানীতির ফলে উদ্ভূত সমস্যার স্থায়ী সমাধানকল্পে আপনার কাছে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ আবেদন নিয়ে এসেছি। আমাদের প্রার্থনা আসাম রাজ্যের কয়েকটি বিশেষ অঞ্চল এবং সংলগ্ন কিছু অঞ্চল নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এ রাজ্যে দশকে দশকে ভাষা সমস্যা, ভাষা দাঙ্গা, অশান্তি, আগামী প্রজন্মের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এসবের সমাধানের একটাই উত্তর হচ্ছে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে বৈচিত্র্যময় উত্তর পূর্বভারতের বিভিন্ন ভাষিক এবং নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংস্কৃতির যথাযথ বিকাশ সম্ভব। বহুভাষিক চরিত্র লক্ষণ নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় উপমহাদের দক্ষিণাঞ্চলে নানা জাতি, নানা ভাষার সমাবেশে একটি মিলনভূমি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমাদের প্রস্তাব এ বিশ্ববিদ্যালয় কোন ব্যক্তিনামে বা কোন শহরের নামে না হয়ে হোক 'পূর্বভারত বিশ্ববিদ্যালয়', যেখানে কোনও একটি জাতি বা একটি ভাষিক গোষ্ঠীর নয়, সব জনগোষ্ঠীই তাঁদের নিজেদের সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্র হিসেবেই এটাকে গড়ে তুলতে এগিয়ে আসবে। আমাদের প্রার্থনা আগামী শিক্ষাবর্ষেই যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়।'

প্রাধানমন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'প্লিজ টেল মি হোয়াট এক্সেক্টলি ইজ দ্যা প্রবলেম অব দ্যা স্টুডেন্টস'?

'আসামের বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রিকালচারেল কলেজগুলোতে বাঙালিদের, আমি বলব, রাজ্যের সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের কোনও নিরাপত্তা নেই। ক্যাজুয়েলটির খবর নিশ্চই আপনার অজানা নয়। বরাক উপত্যকার ছাত্ররা ভর্তির জন্য গেলে অত্যাচারিত হচ্ছে।'

টেবিলের উপর প্রদত্ত স্মারকপত্রটির উপর চোখ বুলাতে বুলাতে প্রধানমন্ত্রী বললেন 'একাডেমিক প্রব্লেম?'

'দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ই বিকল্পহীন ভাবে মিডিয়াম অব ইনস্ট্রাকশন অসমিয়া করতে চাইছে, এতে শুধু বাঙালি নয় মণিপুরি, বড়ো, খাসি, নেপালি এবং অন্যান্য জনজাতিদের মাতৃভাষায় পাঠের সুযোগ আর থাকছে না। অবশ্য,

ইংরেজি আর হিন্দির জন্য কয়েক বৎসর ছাড় রেখেছেন। কিন্তু এরপর তো এরা সবাই বিপন্ন হবে।

'মাননীয়া, প্রধানমন্ত্রীজি, আমরা একই সঙ্গে বরাক উপত্যকার জন্য স্বতন্ত্র মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দাবিও রাখছি। এতে কোনও ভাষিক গোষ্ঠীর সঙ্গে আর দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকবে না। অভিমানী অসমিয়া বন্ধুরা তাঁদের ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষার সংস্থান রাখতে চাইছেন না। এদের সঙ্গে কোন দ্বন্দ্বের আর প্রয়োজন নেই, উই হ্যাব হেড এনাফ অব ইট। বাট--'

'বাট?'

'আমাদের প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জুরিশডিকশন মে বি এক্সটেন্ডেড ফ্রম বরাক ভ্যালি টু এমব্রেস দ্যা মাল্টি লিঙ্গুয়েল এরিয়া অব ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি, পরশনস অব নওগাঁ, গোয়ালপাড়া।'

আইনজীবী আব্দুল বাসিত চৌধুরী সংযোজন করলেন,'বিশ্ববিদ্যালয়টি তাই হতে হবে এফিলিয়েটিং ইউনিভর্সিটি।'

'এন্ড হোয়াট শুড বি দ্যা কোর জিওগ্রাফিক লোকেশন অব দ্যা ইউনিভার্সিটি?'

'দ্যা ডিস্ট্রিক্টস অব সাউথ আসাম-- কাছাড়, করিমগঞ্জ, কার্বি আংলং, নর্থ কাছাড় হিলস।'

'বিফোর উই উইন্ড আপ, এনিথিং মোর ইউ লাইক টু এড?'

'ম্যাডাম, উই নিড ইমিডিয়েট এস্টাব্লিসমেন্ট অব দ্যা ইউনিভার্সিটি, 'কজ আওয়ার স্টুডেন্টস হ্যাভ অল দ্যা ডোর ক্লোজড ফর হায়ার স্টাডিস ইন আদার ইউনিভার্সিটিস— 'প্রধানমন্ত্রী থামিয়ে দিলেন, 'হোয়াই সো? হোয়াই আদার ইউনিভার্সিটিস শুড ক্লোজ ডরস ফর দেম?'

'ইয়েস ম্যাম, এস দ্যা টু 'ভার্সিটিস ইন আসাম স্টিল প্রড্যুসিং গ্রাজুয়েটস অব টু ইয়ার্স ডিগ্রি কোর্স এগেনস্ট থ্রি ইয়ার্স ডিগ্রি প্রিভিলেন্ট থ্রোআউট দ্যা কানট্রি। গ্রাজুয়েটস অব আসাম আর ইনএলিজিবল ফর এডমিশন ইন আদার ইউনিভার্সিটিস, ইনক্লুডিং নেহু, আই মিন নর্থ ইস্ট হিল ইউনিভার্সিটি, শিলং।'

কে জানতো এ সাক্ষাৎকারের ঠিক উননব্বুই দিন পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারাবেন। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দৌড়টা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। দাঙ্গা বিধ্বস্ত রাজধানী নগরীর ছবি দেখতে দেখতে, টেলিভিশনে বিভৎস দৃশ্য দেখতে দেখতে প্রেমেন্দ্রমোহন ভাবছেন এই ক'টা দিনে সমস্ত কিছু একেবারে পালটে গেল।

২৩

শিক্ষা সংরক্ষণ আন্দোলনের পাশাপাশি প্রেমেন্দ্রবাবু বঙ্গসাহিত্যকেও নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়ণে তিনি মনের ভিতর একটা বড়সড় ধাক্কা খেলেন। ছুটে গেলেন সভাপতি মহীতোষ পুরকায়স্থের কাছে।

'এ ভাবে মুষড়ে পড়লে চলবে না। বঙ্গসাহিত্যের পক্ষ থেকেও একই সঙ্গে জনসংযোগ করতে হবে। রাজ্য পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যদের সঙ্গে আলোচনা চালাব আমরা।'

প্রিয়নাথ দেবের চার বছর কার্যকাল শেষ হলে পর মহীতোষবাবুকেই সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হল।

প্রেমেন্দ্রবাবুর চোখের সামনে কত কী ঘটে চলেছে। ইন্দিরা গান্ধীর জ্বলন্ত চিতার পাশেই নতুন নেতৃত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটছে। অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবি ছেড়ে দিলেন, সবাই একবাক্যে রাজীব গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বীকার করে নিলেন।

অগ্নিদগ্ধ দিল্লি, পাঞ্জাব আর আসামের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। এরই মধ্য নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী সম্পাদন করলেন পাঞ্জাব চুক্তি। টিভিতে দেখা সেই দৃশ্য প্রেমেন্দ্রবাবু ভুলতে পারছেন না। চুক্তি সম্পাদনের পর প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী গায়ের বুলেট প্রুফ জ্যাকেটটা আকালি নেতা হরচান্দ সিং লঙ্গোয়ালকে দিতে চাইলে শ্মশ্রুগুম্ফ সম্বলিত শিখ সন্ত সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করলেন, আর নিজ গ্রামে ফিরে যাবার পথে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিলেন। লঙ্গোয়ালের শেষ বাক্যটি তাঁর কানকে বিদ্ধ করে গেছে, 'সাংগ্রুর কিতনে দূর'? এই সাংগ্রুর

শব্দটিই তাঁর কানে বেজে উঠেছে ধর্মদা হয়ে। মনে পড়ে গেল সেই ফেলে আসা গ্রামের কথা যেখানে তাঁরও তো একদিন ফিরে যাবার কথা। ওই সুন্দর গ্রামের হাট ঘাট মাঠ নদী প্রান্তর তো তাঁরই প্রতীক্ষায়। তাঁকে তো একদিন সেই গ্রামে ফিরে যেতে হবে। স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষের কতিপয় ক্ষমতাবান চক্র যে তাঁকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে চাইছে।

আজ পনেরোই আগস্ট। এবার আর স্কুলে পতাকা উত্তোলনে যেতে হবে না। তিনি এখন অবসরপ্রাপ্ত। এবারের স্বাধীনতা দিবস কেমন যেন বিষণ্ণতায় মোড়া। বরাকের আকাশ আজ মেঘে ঢাকা। মাতৃহারা সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে দেশবাসী যাঁকে ভোট দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসাল গতরাত সেই প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের আর কোনও ভাষিক গোষ্ঠীর মতামতের অপেক্ষা না করেই আসামের ছাত্রনেতাদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করে বসলেন। লালকেল্লা থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে এ কথা শুনে অনেকেরই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

এ চুক্তির ফলে নাকি আসামে দীর্ঘ বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। কী আছে এতে? না, ছেষট্টি থেকে একাত্তর পর্যন্ত যাঁরা আসামে এসেছেন এদের দশ বছরের জন্য ভোটাধিকার কাটা যাবে। একাত্তরকে ভিত্তিবর্ষ ধরে আসামে বহিরাগত বিদেশি বিতাড়ন হবে। লালকেল্লা ভাষণে অত অনুপুঙ্খভাবে সব কিছু আসেনি, তবে রাজ্য জুড়ে উল্লাস আর উচ্ছ্বাস দেখে প্রেমেন্দ্রবাবু বুঝলেন এই উচ্ছ্বাসের বন্যার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, মাতৃভাষার অধিকার আর নাগরিকত্ব সমস্ত কিছুই ভেসে যাবে।

২৪

আজ অনেক দিন পর গান্ধী শান্তিপ্রতিষ্ঠানে এসে জমা হয়েছেন মহীতোষবাবু, নৃপেশ গোস্বামী, রাঘবেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। কী মনে করে পলু বিশ্বাস এসেছেন আগেভাগেই। প্রেমেন্দ্রবাবু উপস্থিত একরাস ব্যস্ততা নিয়ে। এখানে একটি কালো রঙের ট্রাঙ্কের ভেতর রয়েছে বঙ্গসাহিত্যের সমুদয় কাগজপত্র। প্রশস্ত টেবিলটিতে ছড়ানো থাকে বেশ কয়েকটি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন। মহীতোষবাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এগুলো পড়েন প্রায় প্রতিদিনই।

পলু বিশ্বাস আসেন মাঝে মধ্যে। আজ তিনি খুটিয়ে খুটিয়ে উপস্থিতির খাতাটি দেখছেন, 'সেই ঘুরে ফিরে কয়েকটি নাম। নতুন কেউ এখানে আসে না দেখি।' নৃপেশ গোস্বামী বলেন, 'ওই যে পাশের ঘরটিতে রয়েছে, 'অরুণ চন্দ গ্রন্থাগার'। ওটা তো একেবারে পাঠকশূন্য। কিন্তু ভালো ভালো বই আছে।'

চশমার ফাঁক দিয়ে তাকালেন মহীতোষ পুরকায়স্থ, 'আসামের চিফ কমিশনার হেনরি কিটিংস সাহেবের বদান্যতায় প্রচুর মূল্যবান বই এখানে এসেছিল। জানিনা সেই পুরাতন বই কি আছে।'

'কিটিংস সাহেব?'

'হ্যাঁ, পৌরসভা প্রথমে কিটিংসের নামেই এ লাইব্রেরি স্থাপন করেছিল। ইনি ১৮৭৪ সালে সিলেট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া নিয়ে গঠিত আসাম প্রদেশের প্রথম চিফ কমিশনার ছিলেন। তাঁর কাছাড় আগমনকে স্মরণীয় করতে এই লাইব্রেরি। স্বাধীনতার পর গান্ধীবাগে এই গ্রন্থাগারটি নতুন নামে এই ভবনে স্থানান্তরিত হয়।'

আলোচনাটা মনোগ্রাহী, কিন্তু প্রেমেন্দ্রমোহন এতে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না। তাঁকে যে বঙ্গসাহিত্যের ফাইল খুলতে হচ্ছে। এরই মাঝে চুপি দিয়ে দেখে গেছে মিউনিসিপ্যালিটির তরুণ কর্মী। এ বৃদ্ধদের বড় আপনজন সে। সদরঘাটে অফিস শেষ করার পথে প্রতিদিন একবার এখানে এসে কাগজ পড়ে যায়। আজ তাঁর প্রিয় ব্যক্তিদের একত্রে দেখতে পেয়ে তাঁর ভারি আনন্দ হল। অল্পক্ষণ পরেই সে ফিরে এল হাতে একটা বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে। তাঁর পেছনে চায়ের ট্রে হাতে একটা বাচ্চা ছেলে। এরা বসবেন, চা খাবেন, গল্পগুজব করবেন, দূর থেকে দেখে ওঁর ভারি আনন্দ। একঝাঁক স্বাধীনতা সংগ্রামীকে কাছে থেকে দেখা নাকি সৌভাগ্যের ব্যাপার। এরা যতক্ষণ থাকবেন পরিতোষ এদিক ওদিকে ঘুরঘুর করবে, তারপর সবাইকে রিক্সায় তুলে দিয়ে মহিতোষবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। তিনি আস্তে আস্তে ধূতির মালকোঁচা ঠিক করে হাতের আস্তিন গুটিয়ে রাস্তায় নামলে সেও সঙ্গে সঙ্গে চলবে। মহীতোষবাবু পারত পক্ষে রিক্সা চড়েন না। পরিতোষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি নাজিরপট্টির দিকে

চললেন। আশপাশের মানুষজন, বাড়ি দোকান সব কিছু দেখে দেখে পথ চলা তাঁর দীর্ঘ দিনের শখ।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে প্রেমেন্দ্রবাবু বললেন, 'এবার বঙ্গসাহিত্যের পক্ষ থেকে আবার কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি উঠাতে হবে। শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতি বিষয়টিকে ঠিক যেখানে রেখেছে সেখান থেকেই ধরতে হবে। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু যদিও আমাদের অগ্রগতি আটকে দিয়েছে— মানে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ--তবুও সরকার বুঝুক এ দাবি প্রকৃতই বরাকের গণদাবি।'

'লক্ষ করছেন কি, বিধুবাবুর পুত্র আজকাল কী সুন্দর লিখছে?' কথাটি শোনা গেল পেছন থেকে।

'মানে করিমগঞ্জের বিধুভূষণ চৌধুরীর কথা বলছেন? যুগশক্তি পত্রিকার সম্পাদক?' বলে তাকালেন মহীতোষবাবু।

কেউ দেখেনি পেছনে এসে বসেছেন জ্যোতির্ময় সেন। তিনি প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে একটি কাগজ টেনে নিলেন। মহীতোষবাবু বললেন 'এই সুজিৎ গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাক উপত্যকার সমাজ ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র জমা দিয়েছে। করিমগঞ্জের বাগবাড়ি অঞ্চলে খুব ঘোরাঘুরি করেছে অনেক দিন, আমি দেখেছি। বাদসার মোকাম, পিরের মাজার আর পুরাতন কালীবাড়ি-- কোথায় সে যায়নি তথ্যের খোঁজে? কী জানি ডক্টরেট পেয়েছে কি না। আমি বলেছি এটা বই আকারে প্রকাশ করো।'

জ্যোতির্ময়বাবু একটা সময় ছিলেন একজন টেলেন্ট রিসার্চার। তাঁর ছিল শিশুদের পত্রিকা, 'পঙ্খীরাজ'। এ কাগজের জন্য পাঠক আর লেখক তৈরি করতে বাড়ি বাড়ি ঘুরতেন আর শিশু কিশোরদের সঙ্গে ভাব জমাতেন। কাছাড় জেলার কে কোথায় কী লিখছে না লিখছে এর ষোলোআনা খবর রাখতেন। সুজিৎ চৌধুরীর প্রসঙ্গে বললেন, 'শিশুদের পত্রিকা সে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তো, আমার সঙ্গে এ নিয়ে কথাও বলত। ইদানীং পলিটিক্যাল কলামও লিখছে যুগশক্তি পত্রিকায়। আসামের বর্তমান সমস্যা, বাঙালির অবস্থান এইসব।' উচ্ছ্বসিত হয়েই তিনি বলছেন, 'বুঝলেন প্রেমেন্দ্রবাবু, সুজিৎ আমাদের

আগামীদিনের একটি সম্পদ। আমি তো পলিটিক্যাল লেখার পাঠক নই, কিন্তু তাঁর লেখার আশ্চর্য জাদু আছে। এরকম কিছু লেখা নাকি গত ইলেকশনের গতি নির্ধারণও করেছে, এটা বলেছে কমলেন্দু।'

মহীতোষবাবু বললেন, 'শুনেছি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নাকি তাঁর লেখা ছাপানোর জন্য টাইমস অব ইণ্ডিয়া পত্রিকা পুড়িয়ে দিয়েছিল। বড়খলার যতিবাবুর ছেলে এর প্রত্যক্ষদর্শী।'

প্রেমেন্দ্রবাবু আর ফাইলে মনোনিবেশ করতে পারছেন না। তাঁর দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময়বাবু বললেন, 'সুজিৎকে বঙ্গসাহিত্যের কাজে লাগান'।

'আমি তো তাঁকে দিয়েই অনেক গবেষণা করিয়ে নিয়েছি। তাঁর কনিষ্ঠ ভাই রবিজিৎও গৌহাটি থেকে আমাদের নানা ভাবে তথ্যপাতি দিয়ে সাহায্য করছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নীতি বা প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি নিয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামতও আছে।'

পলু বিশ্বাস তো এত এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পাত্র নন। কিন্তু বয়জ্যেষ্ঠদের সামনে তিনি নিজের স্বভাব চাপল্য দমন করা জানেন। একমনে সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর পাতা উল্টিয়েই যাচ্ছেন। আরো আধঘণ্টা খানেক তাঁকে এখানে থাকতেই হবে। এরপর তাঁর প্রগ্রাম মণ্টুবাবু, মানে আইনজীবী প্রভাস সেন মজুমদারের সঙ্গে। আচমকা এ আলোচনার মাঝখানে তিনি নীরবতা ভঙ্গ করলেন, 'এই দেখুন যুগশক্তিতে কী লিখেছেন সুজিৎ চৌধুরী', বলে ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ তারিখের কাগজটি এগিয়ে দিলেন।

শিরোনামটি সবার মনোযোগ কেঁড়ে নিল, 'বাস্তুহারার জবানবন্দি'। গোটা পাতার চার কলাম জুড়ে এ প্রবন্ধটি শুরু হয়েছে একেবারে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ দিয়ে—

'সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার বানিয়াচঙ গ্রামে আমাদের মূল বাড়ি ছিল'। পঙক্তিটি সবাইকে নস্টালজিক করে তুলল। এরপর এল সংগ্রামী সুশীল সেনকে কিংস্ফোর্ড সাহেবের বেত্রাঘাতের প্রসঙ্গ, যার প্রতিশোধ নিতেই অভিরামের দ্বীপ চালান আর ক্ষুদিরামের ফাঁসি। সুশীল সেনের ভাই হেমেন সেন আর বীরেন সেনকে লেখক নাকি ছোটবেলায় দেখেছেন। পুলিশি সংঘর্ষে সুশীল

সেন মারা যাবার পর এ দুই ভাইকেও জেলে নিয়ে রাখা হয়েছিল। জেলের ভেতর এদের দিয়ে ঘানি টানানোর ফলে কাঁধে দুটো বড় ক্ষতর দাগ দেখা যেত। এসব বর্ণনা দিয়ে লেখক লেখক বলছেন, 'এই ছাপ দুটি দেশপ্রেমিকের প্রতি ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত উপহারের স্মারক।' এর পরের পঙক্তিতেই লেখক তাঁর কাঙ্ক্ষিত জায়গায় এসে পৌঁছোলেন, "বীরেন সেন মরে বেঁচেছেন, নইলে তৃতীয় আরেকটি ছাপ স্কন্ধে বহন করে তাঁকে মরতে হত, 'বিদেশী' নাগরিকের ছাপ।"

পলু বিশ্বাসের কণ্ঠে এটুকু শোনার পর সবাই উৎকণ্ঠিত পরবর্তী অংশটি শোনার জন্য। কিন্তু তাঁর তো ওদিকে যাবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এতজন উদগ্রীব শ্রোতাকে উপেক্ষা করার সাধ্য নেই তাঁর। যতটুকু সম্ভব নিরাবেগ উচ্চারণে বাকি অংশ পড়া শুরু করলেন। এক একটি বাক্য পড়ছেন আর দেখছেন এক এক জনের একএক বিশেষ অভিব্যক্তি।

পাঠ চলছে—

'আমার বাবা অত বড়মাপের দেশপ্রেমিক ছিলেন না', কিন্তু কয়েকটি পঙক্তি পরেই লেখক জানালেন পুলিশ সুপার কী ভাবে তাঁর বাবার তর্জনীটি লাঠির আঘাতে অকেজো করে লেখনী বন্ধ করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি মধ্যমা আর অনামিকা ব্যবহার করে লেখার অভ্যাস বদলে ফেলেছিলেন।

পলু বিশ্বাস নিজেই আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলেন পড়তে পড়েতে, 'আমার বাবাকে মানুষ বলত স্বদেশী, তাঁর সন্তান আমাদের এখন বলা হয় 'বিদেশী'। তিনি শ্রোতাদের দিকে তাকাতে পারছেন না, সবার চোখেই জল। একটি ক্ষুদ্র কলেবরের নিবন্ধ যে এতখানি নাড়া দিতে পারে সে তো তিনি ভাবেননি—

> 'মনে পড়ে এগারো বছর বয়সে প্রথম যেদিন খণ্ডিত মানচিত্রের পূর্বতম প্রান্তে পা রেখেছিলুম, সেদিন কিন্তু আমাদের চেতনায় অন্যরকম প্রত্যয়ের প্রবাহ বইছিল। আমার মায়ের চোখে সেদিন ছিল খুশির অশ্রু, বাবার মুখে দেখেছিলুম হারিয়ে যাওয়া ধ্যানকে ফিরে পাওয়ার প্রশান্তি। আমাদের সহযাত্রীদের মধ্যে মহিলা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা উলুধ্বনি দিয়ে শুভ মুহূর্তটিকে চিহ্নিত করেছিলেন, আমরা শিশুরা জয়ধ্বনি দিয়েছিলুম।'

নিরাবেগ ব্যক্তিত্ব, নীরব কর্মী পাঠশালার মাস্টারমশাই নৃপেশ গোস্বামী এবার আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। হয়তো নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সব মিলে যাচ্ছে। তিনি বলে উঠলেন, 'পলুবাবু, আর পারছি না, আপনি বন্ধ করুন।'

সমস্ত পরিবেশটি কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। হতভম্ব পলুবাবু থেমে গেলেন দেখে মহীতোষবাবু মৃদু স্বরে বললেন, 'দেশভাগ যে কী নির্মম অভিশাপ এটা কেমন তুলে ধরল সুজিৎ।' করিমগঞ্জের বাগবাড়ির সন্তান মহীতোষ পুরকায়স্থকে অবশ্য বাস্তুচ্যুতির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়নি, কিন্তু বাস্তুহারার মর্মজ্বালা তাঁর মত কজন রাজনৈতিক নেতা অনুভব করতে পেরেছেন?

একটু বিরতি নিয়ে পলু বিশ্বাস পড়া শুরু করলেন,

> 'রাষ্ট্র কর্তৃক অবহেলিত হয়েছি, দুর্জন কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছি, অপমান অবিচার আমাদের নিত্যদিনের সহচর -তবুও অভিমানবশেও কেউ বিচ্ছিন্নতাবাদী হইনি, গুপ্তচর হইনি, দেশমাতৃকার রবাহূত সন্তান পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের মধ্যে কোনো বেইমান এখন পর্যন্ত জন্মায়নি। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা, গুপ্তচররা বরঞ্চ জন্মাচ্ছে তাদেরই মধ্যে, যারা দেশজননীর বিশেষ আদরের সন্তান হিসেবে চিহ্নিত, আমরা অনাদরের সন্তান, কিন্তু মাতৃঋণের কাছে আমাদের বিবেক এখনও দায়বদ্ধ।'

অনেকদিন এরকম নিবন্ধ পড়া হয়নি। অনেকদিন এরকম পাঠও শোনা হয়নি এ ভাবে। আজকের এই সন্ধ্যায় শিলচরের এক সময়ের খ্যাতিমান নাট্যকর্মী, আবৃত্তিকারের ভরাট কণ্ঠে উচ্চারিত প্রবন্ধের শেষ কথাগুলো বাইরের জমাট বাঁধা অন্ধকারের বুক চিরে কোন দূর আকাশের গায়ে মিশে গেল --

> 'যদি নির্বাসন দাও তা মাথা পেতে নেবো—নির্বাসিত জীবনের দুর্যোগতম মুহূর্তেও আমরা মাতৃ পরিচয় ভুলব না, কারণ আমাদের ভারতীয়ত্ব শুধুমাত্র মানচিত্রনির্ভর নয়, এই ভূখণ্ডের মহত্তর ধ্যানরূপ আমাদের হৃদয়ে স্থাপিত। তবু, হে ভারতজননী, নিজ বাসভূমে পরবাসী সেজে থাকার দুর্বহ গ্লানি থেকে আমাদের উদ্ধার করো।'

২৫

শিলচর শহরে যাঁদের দুপুরবেলা অফিস পাড়ার দিকে যাতায়াত আছে তাঁদের জানা, বেশ কয়েকজন বয়ঃবৃদ্ধ এই প্রখর গরমে ছাতা মাথায় গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে যান মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের দিকে। এদের গন্তব্য পরিতোষ দের টেবিল। এ এক অপূর্ব দৃশ্য। পুষ্পরঞ্জন গুপ্তের বাড়ির ট্যাক্স জমা হবে, করুণাময় চক্রবর্তীর ডাক্তারের টিকিট, জ্যোতর্ময়বাবুর পেনসন উঠবে, মালুগ্রাম থেকে খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে এসে শচীন্দ্রমোহন দত্ত মানে সবার লাকুদার চাই একটু বিশ্রাম, মদ্যনিবারণীর ছাপানো পোস্টার কবে আসবে এ খবর নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবার পথে এমনিই আসবেন প্রাক্তন সাব ইন্সপেক্টর অব স্কুলস, রাঘবেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। পরিতোষ হাঁকডাক করে এতগুলো চেয়ার আনাবে, ফেন চালিয়ে দেবে মাথার উপর, সামনে ধরিয়ে দেবে আজকের কাগজখানা। একমুঠো লজেন্স এদের সামনে দিলে এরা একেবারে শিশুর মতো খল খল করে ওঠেন। এতজনের বিচিত্র বায়না এবং সমস্যার মুশকিল আসানের নির্ভরযোগ্য স্থল হল এই পরিতোষের টেবিল। কারো কিচ্ছুটি করতে হবে না-- 'আপনারা বসুন, চা বলছি, আমি কাজ করিয়ে দিচ্ছি।'

ইউনিয়নের লিডার পরিতোষের আছে বেশ কয়েকটি চেলা। এরা পারে না হেন কাজ নেই। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই সব কাজ হাসিল। হাউস ট্যাক্স, ইলেকট্রিক বিল, ডাক্তারের টিকিট আর জ্যোতির্ময়বাবুর পেনসনের চালান ট্রেজারি হয়ে ব্যাঙ্ক করিয়ে কড়কড়ে ক'টি একশো টাকার নোট তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তবে কাজ সমাপন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এসব কাজের জন্য অফিসের কর্মীরা হাতের কাজ ফেলে বাইরে যাবে-- ব্যাঙ্ক, ট্রেজারি অফিসার, বরদা দাসের বাড়িতে ইলেকট্রিক অফিসের বিল ক্লার্ক-- কেউই কিচ্ছুটি বলতে পারবে না, পরিতোষের কথাই এখানে শেষ কথা।

ইতিমধ্যে আরেক বৃদ্ধ সরোজ দাস মহাশয় তাঁর মারুতিগাড়িখানা নিয়ে অফিসের সামনে এলে পরিতোষ তাঁকে ধরে এনে বসাতে গেলে সহকর্মীদের মন্তব্য কানে এল, 'পরিতোষের গান্ধীমেলা আজ জমে গেছে।' তাঁর সহাস্য উত্তর, 'না, না, এখানে শুধু গান্ধী নয়, লালঝাণ্ডাও আছে।' বলে ইঙ্গিত করল ভূপতি চক্রবর্তীর দিকে।

এরা সবাই শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি তো বটেই। ভি-আই-পিরা এলে এদের সঙ্গেও দেখা করে যান, নানা অনুষ্ঠানে এদের উপস্থিতিও থাকে। একসঙ্গে বসলে এদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিন্নতা থাকে না। এখানে বসে শিশুর মতো ওঁরা কত প্ল্যান প্রগ্রামও করেন-- স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখবেন, এখানে ওখানে বেড়াতে যাবেন আরও কত কি। চা খেয়ে শরীর চাঙ্গা করেই লাকুদা প্রস্তাব করে বসলেন, 'চলুন, একদিন বড়খলা যাই।'

'বড়খলা?'

-হ্যাঁ, বড়খলায় যতিবাবুর বাড়িতে। আমাদের স্টেন্ডিং ইনভাইটেশন আছে। পুকুরে জাল ফেলে মাছ ওঠাবেন, পাঁঠাও মরবে। বিরাট উঠানে বা টঙ্গিঘরে সারাদিন গল্পগুজব করব।' বলে দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে আরেক শ্মশ্রুগুম্ফ সমন্বিত সরোজবাবুর দিকে তাকালেন।

পুষ্পরঞ্জন গুপ্ত কিঞ্চিত উষ্মার সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আপনারা কেবল ভোজনের কথাই বলছেন। এত দূর গিয়ে যতিবাবুর কয়েক পদ গান না শুনে কি আসা যায়?'

এদের ছেলেমানুষী দেখে পরিতোষ হাসে, 'আপনেরা যাই করুন, দিনে দিনে ফিরে আসতে হবে, বড়খলার রাস্তা কাছাড়ের মধ্যে ওয়ার্স্ট।'

গানের প্রসঙ্গ টেনে জ্যোতির্ময়বাবু বললেন, 'যতিবাবুর গান অবশ্য আমি শুনেছি হেম দত্তর বাড়িতে। সেই কী গলা। জিজ্ঞেস করবেন জয়ন্তী প্রেসের গজেন দত্তর পুত্র গোবিন্দকে। সে তখন ছাত্র। মনে আছে আমার সঙ্গে গান শুনতে সেও বসেছিল'। কথাটা কেঁড়ে নিলেন পুষ্প গুপ্ত, 'শুনুন আমার বাড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের লাগোয়া। মহারাজ পুরুষাত্মানন্দ আর সিলেট মিশনের স্বামী সৌম্যানন্দর সঙ্গে যতিবাবুর বন্ধুত্ব। এই গানের সূত্রে। একবার মিশনে যতিবাবুর আগমনী গান শুনে চোখের জলে একাকার স্বামী সৌম্যানন্দজি যতিবাবুকে সিলেট নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই পদগুলা— কবে যাবে বলো গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে, বোঝাব মায়ের ব্যথা গণেশকে তোর আটকে রেখে। সে কতদিন আগের কথা। মনে হয় এই সেদিন। সঙ্গতে থাকতেন ধীরেন মোক্তার, মানে ধীরেন চক্রবর্তী।'

'অত দূরে কেন, এই সেদিন, স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকীতে যতিবাবুর গান—জয় মহাবীর মারুতি, জয় অঞ্জনানন্দন মুণিজন ভঞ্জন, লহ লহ প্রণতি—স্বয়ং বিবেকানন্দের রচনা' এই বলে বীজয়ীর গর্বে এদিক ওদিক তাকালেন জ্যোতির্ময়বাবু। মূল প্রস্তাবক লাকুদা এই সব ভাবুকদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "ভাব নাই ভক্তি নাই, উবা উবা ফাল'। শুনিছইন না তো যতিবাবুর গা গরম করা গান। আপনারা যেতা ইচ্ছা করইন, আমি তো গিয়াউ ফরমাইস দিমু মুকুন্দদাসর গান-- জাগো রে সন্তান হিন্দু মুসলমান, নিতে হয় মুকুন্দরে নিও গো সঙ্গে।''

রাঘববাবু বললেন 'তবে দিন ঠিক করুন', সরোজবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু আপনার এই ছোট্ট গাড়িতে হবে না। একটা বড় গাড়ি লাগবে।'

পরিতোষ সঙ্গে সঙ্গে হাজির, 'কাকাবাবু, আপনাদের কিছু করতে হবে না। আমি একটা স্টাফকার জোগাড় করে দিব। কবে যাবেন আমাকে একদিন আগে জানালেই হবে। তবে বড়খলায় একটা খবর দিলে বোধহয় ভাল।'

সবাই হা হা করে উঠলেন, 'না, না, এডভান্স খবর দিয়ে আর বিব্রত করা কেন?'

এদের এসব কাণ্ড বিস্তর দেখা আছে রাঘবেন্দ্রবাবুর স্ত্রীর। এদের অভিযানের কথা শুনে তিনি একটি মোক্ষম মন্তব্য করেছিলেন, 'চেহারা ছবিতে বৃদ্ধ হলেও বুদ্ধিবৃত্তি আর কাণ্ডজ্ঞানে এরা শিশু।'

তিনি বেশ জোর দিয়ে বলেন এরা শিশু ছাড়া আর কিছুই নন।

'কেন বলছেন বলুন তো।'

'একটি ঘটনাই বলি শোনো। আমার নাতিনকে সেরিল্যাক খাওয়ানো ছিল এক বিরাট যুদ্ধ যেমন আজকাল সব বাড়িতেই হয়। এরকমই একদিন বৈঠকখানাতে বসে এরা শুনছেন ভিতরের চ্যাঁচামেচি। এরই মধ্যে একজন মন্তব্য করলেন আজকালকার শিশুখাদ্য নিশ্চয়ই মোটে সুস্বাদু নয়। নইলে বাচ্চা খাবে না কেন?'

পরবর্তী ঘটনা চমকপ্রদ। বিক্ষুব্ধ দিদিমা জন্য কয়েকবাটি সেরিল্যাক বানিয়ে ওই বৃদ্ধদের হাতে তুলে দিলে এরা খুব রসিয়ে শিশুখাদ্যটি উপভোগ করলেন। 'না, এতে কোনও সমস্যা হবার তো কথাই নেই'। চঞ্চল নাতনিটির কেন এটা অপছন্দ এ সমস্যার কোন সমাধান বের করার দিকে অবশ্য ওঁরা আর এগোলেন না। অতঃপর এ বাড়িতে এসে সুস্বাদু শিশুখাদ্যে আপ্যায়িত হয়ে এরা পরম প্রীতি লাভ করতে থাকলেন। ওদিকে বিমূঢ় দিদিমা বৃদ্ধদের জলখাবারে শিশুখাদ্যের টিন উল্টে দিয়ে আসল বাচ্চাটির পুষ্টির বিকল্প খুঁজে খুঁজে হায়রান।

২৬

গান্ধী শান্তিপ্রতিষ্ঠান থেকে ফিরে এসে প্রেমেনবাবু ফাইল খুলে দেখছেন তাঁর দুটো সংগঠনের সদস্য কারা। দেখার উদ্দেশ্য হল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কার অবস্থান কোথায় বুঝে রাখা। চারিদিকে এত প্রলোভন, এত উস্কানি। এর ফলে অনেকের মনের মধ্যে নানা সংশয় তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় আমরা কোন পথে যাব, এটা একটা বড় প্রশ্ন।

আসাম চুক্তির বিরুদ্ধে যাঁরা শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতির অভিবর্তনে স্বোচ্চার হয়েছিলেন, 'এ চুক্তি বাতিল কর', এরাই আবার সুর নরম করছেন, কেউ কেউ ভিন্ন সুরেও কথা বলছেন। আমাদের স্পোর্টসম্যান সাংসদ এসব কী কথা বলছেন? তিনিও এদের কথায় সায় দিচ্ছেন, আসাম চুক্তি নাকি 'ম্যাগনা কার্টা' অব আসাম।

'ম্যাগনা কার্টা কি না জানি না, তবে বাঙালির গলা কাটা তো বটেই।' বলছেন প্রৌঢ় মার্ক্সবাদী নেতা। তিনি কিন্তু কদাপিও এসব কথা তিনি জনসমক্ষে বলবেন না। দলগত বাধা আছে। ইতিমধ্যে অনেক কমরেডের রক্তে আসামের মাটি লাল হয়েছে, অনেকে এখনও ঘরছাড়া। এখন এদের একটু রয়ে সয়ে কথা বলতে হবে বৈ কি।

গুরুচরণ কলেজের অধ্যাপক বিজিৎ চৌধুরীর বাড়িতে হাজির হয়েছেন অনন্ত দেব, অনুরূপা বিশ্বাস, পলু বিশ্বাস, আর উদীয়মান শিল্পী শুভপ্রসাদ, গৌতম দত্ত এবং আরও কয়েকজন। এরা সব 'দিশারী'র সদস্য। একের পর একটা 'মৈত্রী উৎসব' করে যে সম্প্রীতির বার্তা পাঠিয়েছেন ওই উপত্যকায়, এ

সব কি কেবল কথার কথা হয়ে গেল—এরকম প্রশ্ন উঠতে পারে তাই এখন কী করণীয় এ নিয়ে একটা প্রাথমিক আলোচনা।

'আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হব না। এ রকম দুর্দিন অতীতেও এসেছিল। তার ফলে কি সমস্ত সম্প্রীতির আয়োজন ব্যর্থ? এই যে নিরুপমা বড়গোঁহাই, হোমেন বড়গোঁহাই, নবকান্ত বরুয়া, মেদিনীমোহন চৌধুরী, দিলীপ শর্মা, প্রতিমা পাণ্ডে, মুকুট শর্মাকে আমন্ত্রণ করে মৈত্রী অনুষ্ঠান, এর সুদূরপ্রসারী ফল নিশ্চয়ই আছে।'

'দেখলেন, ওরা কাছাড়েও জাল বিছিয়েছে। আসাম আন্দোলনের সমর্থনে কারা কাছাড়ে লিফলেট ছড়াচ্ছে--' বলে শুভপ্রসাদ পকেট থেকে বের করল একখানা কাগজ। 'গৌহাটিতে আমাদের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবের বিরোধিতায় নেমেছে ওঁরা।'

বিজিৎবাবু বললেন, 'বিজয়া চক্রবর্তীর কাণ্ড দেখলেন না? পাগলের মতো হাত পা ছড়িয়ে কী চিৎকারই না করলেন। প্রাথমিক আলাপেই যদি এ অবস্থা, তবে বিল উঠলে যে কী করবেন কে জানে।'

অনুরূপা বিশ্বাস বলেন, 'আমরা আমাদের কাজ করে যাব। তবে এবার প্রেমেন্দ্রবাবুর পেছনেও দাঁড়াতে হবে। তিনি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিকে অনেক এগিয়ে নিয়েছেন। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর যদিও বিষয়টি একটু পিছিয়ে গিয়েছিল, এখন কিন্তু আবার পালে হাওয়া লেগেছে।'

বিজিৎবাবু বলে উঠলেন, 'সন্তোষমোহন দেব আসাম চুক্তি নীরবে সমর্থন করে যে ভুল করেছিলেন, এবার বরাক উপত্যকার জন্য কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাটি রাজীব গান্ধীর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে তিনি একটি কাজের কাজই করেছেন।'

অনন্তবাবু তেড়েমেরে উঠলেন, 'হেমাঙ্গদার গানটি মনে আছে না—ঠগের বাড়ি নিমন্ত্রণ বুঝিনু এই বেলা/রাজভোগ খাওয়াইত কইয়া খাওয়াইল কাচকলা। অত আগে সার্টিফিকেট দেওয়া ঠিক না, প্রদেশ কমিটির একজনও আমারার কথা ভাবেন না। রানাবাবু একলা রিস্ক নেওয়ার মানুষ নায়।' বিশ্বনাথ

কিছু একটা বলতে উপক্রম করতেই অনন্তবাবু স্থানকাল পাত্র ভুলে 'তোমার তো রাজায় কইলা ---আনন্দের আর সীমা নাই।'

বিজিৎবাবু হেসে উঠলেন, 'অনন্তবাবু, আপনার তাল পাওয়া যায় না। আপনি যে কোন সময় কোন পার্টির সাপোর্টার কে বুঝতে পারে। তবে ইউনিভার্সিটি নিয়া আমার ঘরে কাইল যে কত তুফান উঠব আমিই জানি।'

'কারণ?'

'কারণ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাল আসছেন। ড. সুজিৎ চৌধুরী। চ্যাংড়াদের সুজিৎদা। প্রেমেন্দ্রবাবুর সঙ্গে কাজ। কিন্তু তান সাঙ্গপাঙ্গরা এডভান্স খবর পাইছইন।'

অনন্তবাবু বললেন, 'আমারও তো একটা কাজ আছে সুজিৎবাবুর সঙ্গে। থাকবানি?'

অনুরূপা বিশ্বাস, 'বিজিৎবাবু, ভাইরে মনে করিয়া কইবা দিদিরে না দেখিয়া যেন যাইন না। সিলেট-কাছাড়ের ইতিহাস নিয়ে যে কাজ আরম্ভ করছইন এই বিষয়েই আমার কিছু কথা আছে।'

বিজিৎবাবু হেসে উঠলেন, 'নতুন বুদ্ধিজীবীরার ঠেলায় আমিই ঘর ছাড়া অইমু, আপনারা কই দাঁড়াইবা আমি জানি না।'

২৭

সকাল থেকেই জিসি কলেজ হোস্টেল সুপারের বাড়িতে হাজির হচ্ছেন সুজিৎ চৌধুরীর মক্কেলরা। ভিতর থেকে দফায় দফয়ায় চা আসবে, চলবে দিনভর আড্ডা। সবার সঙ্গেই বন্ধুর মতো কথা বলবেন তাঁদের প্রিয় সুজিৎদা। এরা বলে সুজিৎদা একমাত্র নিজের স্ত্রী, বৌদি আর শালী ছাড়া কাউকেই তুমি বলেন না। সবাইই তুই। তাঁর মুখে এটা মানায়ও বেশ।

অগ্রজ লম্বা ঘের দেওয়া কড়া ইস্তিরি করা পাজামা আর শার্ট পরে এঘর ওঘর করছেন আর মোক্ষম সময়ে দু একটা মৃদু মন্তব্য করে চলে যাচ্ছেন।

'আমি তো বেমানান। তোমাদের বুদ্ধিজীবীদের দলে আমি কোথায় দাঁড়াই', বলে দুই ব্যাগ নিয়ে বাজারের দিকে চললেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার জনপ্রিয়তা দেখে তিনি ভেতরে ভেতরে গর্বিত।

চার্মিনারে সুখটান দিয়ে সুজিৎবাবু বললেন, 'আমি এসেছি প্রেমেন্দ্রবাবুর আর্জেন্ট তলব পেয়ে। একাই একটি লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকে খাড়া করে দিয়েছেন।'

'কেন ওঁর সঙ্গে তো আরও অনেক আছেন।'

'কী বলছ? তোমরা আছো কি? খবর রাখো না তো কিছুরই। তোমরা তো এ আন্দোলনে নেই। শোনো, তাঁর সঙ্গে আছে যারা এদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকার কথাও না। এরা হাইস্কুল আর মাদ্রাসার শিক্ষক, পাঠশালা এবং এমই স্কুলের শিক্ষকও আছেন।'

'কলেজ টিচাররা কি তাঁকে সাপোর্ট দিচ্ছেন না?'

'আমি বলছি সে তুলনায় কলেজ টিচার, মানে অধ্যাপক তো হাতে গোনা। বিজয় ধর, গীর্বাণ বিশ্বাস, ফণীভূষণ দাস, অশ্বিনী চক্রবর্তী। নাম বললে আরও অনেক বলতে পারব, কিন্তু আমি বলছি সার্বিক ভাবে অধ্যাপকদের মধ্যে সেরকম চেতনা নেই, যদিও বিশ্ববিদ্যালয় এলে এদের লাভটা হবে প্রত্যক্ষ, তোরা দেখিস।'

সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে, 'প্রেমেন্দ্রবাবুর সামনে কতবড় চ্যালেঞ্জ। বিশ্ববিদ্যালয়টা কী জিনিস তাও বোঝাতে হচ্ছে এই সঙ্গীদের। তোমরা তো শিক্ষামন্ত্রকে পাঠানো মেমোরেন্ডামগুলো দেখনি। একজন স্কুল প্রধান, যাঁর বিশ্ববিদ্যালয় কেন, কলেজ সিস্টেম সম্পর্ক হাতেকলমে কোন অভিজ্ঞতা নেই তিনি স্রেফ সাধনার জোরে দিল্লিতক পৌঁছে গেছেন একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা নিয়ে। ইন্দিরা গান্ধীকে তো কনভিন্স করিয়ে নিয়েছিলেন। যদি সত্যিই আমাদের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় আসে, বরাক উপত্যকা কি এ ব্যক্তিকে ভুলতে পারবে?'

ঘরে উপস্থিত অপূর্ব, অমলেন্দু, কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী। একে একে আসছেন লেখক, কবি, নাট্যকর্মী, বাম, অতিবাম উৎসাহী যুবকের দল। প্রিয় সুজিৎদার সান্নিধ্য পেতে সবাইই উদগ্রীব। সবারই প্রচুর কথা বলার আছে, কিন্তু কেউই মুখ খুলছে না। সুজিৎদার কথাই শোনা যাক।

ঘরে ঢুকেছেন আইনজীবী, ইমাদউদ্দিন বুলবুল। হাতে একটি লেটার প্রেসে ছাপানো ম্যাগাজিন। এতে উনিশ শো একষট্টির ভাষা আন্দোলন বিষয়ক একটি দীর্ঘ নিবন্ধ। ইচ্ছে এটাকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। টাইটেলও ঠিক করে রেখেছেন, 'দেশি ভাষা বিদ্যা যার।'

'এ নিবন্ধের কথা আমি শুনেছি। খুব ভালো হল টেক্সটি হাতে পেয়ে। প্রস্তাবিত বইয়ের নামটা কী বললেন, 'দেশি ভাষা বিদ্যা যার?'

'ভাষা আন্দোলন নিয়ে আমাদের যাতে আর কেউ বিভ্রান্ত করতে না পারে, তাই এ প্রয়াস। উনিশ নিয়ে আমাদের মনে আর যেন কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব না থাকে।' খুব প্রত্যয় নিয়ে কথাটি বললেন ইমাদউদ্দিন। সুজিৎবাবু আধপোড়া সিগেরেটটা ট্রেতে গুঁজে দিতে দিতে বললেন, আশাকরি আপনার বই প্রকাশিত হলে আমাদের এ প্রত্যাশা পুরণ হবে।'

বুলবুল উৎসাহের সঙ্গে বললেন, ''আমি টাইটেলে একটা বিশেষ ইঙ্গিত রাখতে চাই।-'দেশিভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়, নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশে না যায়' এখান থেকেই ক্যাপশনটা নিয়েছি।''

সুজিৎবাবু তাকালেন অমলেন্দুর দিকে। অমলেন্দু বললেন, 'এটি মধ্যযুগের কবি আব্দুল হেকিমের একটি পদ। সেদিন দ্বন্দ্ব ছিল বাংলা বনাম ফার্সির। একদল বলছেন আরবি-ফার্সিই হল অভিজাত ভাষা, বাংলা তো প্রাকৃত জনের ভাষা।'

বুলবুল বললেন, 'ঠিক তাই, ষাট ইংরেজিতে অনুরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে চলেছিল। গ্রাম কাছাড়ের মানুষের মনে তৈরি করা হয়েছিল বাংলাভাষা সম্পর্কে একটা বিভ্রান্তি। এর পেছনে কোন চক্র সক্রিয় ছিল, এটা আমার বইতে কোন আভাসে ইঙ্গিতে নয়, একেবারে সুস্পষ্ট ভাবেই তুলে ধরব।'

বিজিৎবাবু দুই ব্যাগ ভর্তি বাজার নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, ‘সেমিনারটা কোন পর্যায়ে আছে? আমার কপালে তো বিদ্বৎজনের বাক্য শোনার ভাগ্য নেই। এক্ষুণি যেতে হবে হোস্টেলে। তো তোমরা চা পেয়েছো তো?’

সবাই একবাক্যে বলল, ‘হ্যাঁ, পেয়েছি।’

‘ধ্যুৎ, সে তো অনেক আগে, তোমরা পেলে আমার ভাগ্যেও এককাপ জুটতে পারে’ বলে ভেতরের দিকে হাঁক পাড়লেন। শক্তিপদ উঠে যাচ্ছেন দেখে সুজিৎবাবু বললেন, ‘চা আসছে, আপনি উঠলে হবে কেন? এই অবকাশে আপনার একটা কবিতা শুনব না, তা হয়কি?’

‘কবির পকেটে তো কবিতা নেই। এই দেখুন একটি নীরস গদ্য, বাজারের স্লিপ’, বলে কাগজ টুকরো বের করে পড়তে শুরু করলেন, ‘গ্লিসারিন এক শিশি, বার্লি এক প্যাকেট।-কোথায় পাব বার্লি কে জানে।’

ওদিক থেকে কে বলল, ‘বার্লি আজকাল কেউ খায় নাকি? কে খায় স্যার?’

‘কোন মানুষে খায় না, বার্লি খায় সুতির কাপড়। এতে নাকি খুব মসৃণ কলপ হয়।’

‘আগে আরো একটি জিনিস ছিল—শটি। বাচ্চারা খেত, আজকাল এটাও বিলুপ্ত। মনে আছে ব্রাহ্মণ শটির কথা’, অমলেন্দুর কথা শুনে বিজিৎবাবু বললেন, ‘শটি নেই, ব্রাহ্মণ তো আছে।’

দাদার কথা শেষ হতেই সুজিৎবাবুর বাক্য, “কবিতায় এখনও টিকে আছে শটি, --শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে’—বড় মোক্ষম সময়ে অমলেন্দু শব্দটি বলেছে, এ সূত্রে জীবনানন্দ এসে হাজির হলেন এ আসরে।”

বেশ আবেগে আক্রান্ত হয়েও শক্তিপদ নিরাবেগ কণ্ঠে পুরো পঙক্তিটি বললেন,

‘ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি কবে চাঁদ চম্পার কাছে

এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিল—'

পরিবেশটা হঠাৎই অন্যরকম হয়ে গেল। যে ব্যক্তিটির মাথায় প্রতিনিয়ত কৌতুককর চিন্তা আর মুখে তীর্যক হাস্যমিশ্রিত বাক্যের স্ফূরণ, সেই বিজিৎবাবুও গম্ভীর হয়ে কৌচের একপাশে হাঁ করে বসে পড়লেন। সবার দৃষ্টি শক্তিপদর দিকে।

'এই শটিগাছ কবে দেখেছি মনে নেই, তবে শব্দটিই বড় নস্টালজিক। দেশের কথা মনে করিয়ে দেয়।'

'আমাদের গ্রামে বছর কয়েক আগেও আমি দেখেছি' বলল সুজিৎ চৌধুরীর স্নেহধন্য এক ভিলেজ স্কুল মাস্টার, 'অনেকটা কিত্তা পাতার মত পাতা। ফাটক বাজারে গুড় কিনতে গেলে দেখবেন কিত্তা পাতায় মুড়ে দেয়।'

সুজিৎবাবু বললেন, 'শুধু গুড় নয়, তামাক আর চিটাও এই কিত্তা পাতার মোড়কে বিক্রী হয়।' বলে সিগেরেটে একটা সুখ টান দিলেন, যেন পরম আমেজে তামাক টানছেন।

'সুজিৎদা! আপনি লক্ষ করে থাকতে পারেন, জীবনানন্দের রূপসী বাংলার কবিতার ছত্রে ছত্রে এমন সব জিনিস রয়েছে যার সঙ্গে এ যুগের মানুষের পরিচয়ই নেই, এগুলোর অনেক কিছু বিলুপ্ত হয়েও যাচ্ছে।'

'যেমন?'

'যেমন আকন্দ, ধুন্দুল, নাটাফল কিংবা ক্ষিরুই। আজকের প্রজন্ম কি সনাক্ত করতে পারবে এগুলোকে? আরেকটি কবিতায় দেখেছি ফোঁপরা, ফোঁপরা মহলা ঘাট। এটা শোলার প্রাইমারি রো ম্যাটেরিয়েলস। এখন তো থার্মকল এসে গেছে।'

শক্তিপদ পঙক্তিগুলো স্মৃতি থেকে উদ্ধার করলেন,

'তারাবনে পড়ে আছে বিচূর্ণ দেউল,

বিশুষ্ক পদ্মের দিঘি—ফোঁপরা মহলা ঘাট—'

"হ্যাঁ স্যার, আমাদের ধান ক্ষেতের শেষপ্রান্তে, মানে রাজসীমানার গা ঘেঁষাঘেঁসি একটা খালের পাড়ে দেখেছি ফোঁপরার ঝাড়। আর কি বলব-- এর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে হরিণছড়ার খাল, আমরা বলতাম টাইয়ার খাল। জীবনানন্দের বর্ণনায় আছে -'পাশ দিয়ে খল খল খল বয়ে যায় খাল'--। আমি তো গ্রামবস্তিতে এসব খুঁজে বেড়াই।"

'চমৎকার! তুই তো দেখছি রূপসী বাংলার অন্যভুবন খুঁজে পেয়েছিস। দেখলি তো, শহরের কলেজে চাকরিটা তোকে না দিয়ে ওঁরা ভুল করেনি'-- বলে পিঠ চাপড়ে দিলেন সুজিৎ চোধুরী।

সবাই আবার শক্তিপদর দিকে তাকালে তিনি বললেন, 'এই তো বেশ। কবিতা তো জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই আলোচনায়।'

কিন্তু কেউ মানছে না। শক্তিপদ বুঝলেন কবিতা একটি বলতেই হবে। দু বার হাতের ঘড়িটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখুন, কবিতা তো মুখস্ত থাকে না। গানের ক্ষেত্রে এই একটা সুবিধা, সুরের অবলম্বন থাকে, এর কাঁধে চেপে শব্দরা কেমন গায়কের ঠোঁটে হাজির হয়' বলে শুভপ্রসাদের দিকে তাকালেন।

'সুরের তুলনায় কাগজ মোটেই নির্ভরযোগ্য কোন মাধ্যম নয়।'

চায়ের ট্রে নিয়ে এলেন শ্রীমতী অনিমা চৌধুরী। বিজিৎবাবু বলবেন, 'বসো, চা আমরা নিজেরাই নিয়ে নেব। কবিতা একটা শুনো। হাতাখুন্তির শব্দের চাইতে মোটেই খারাপ হবে না।'

সুজিৎ চৌধুরীর উসখুস ভাব দেখে বৌদি বুঝে নিয়েছেন—'দাঁড়াও রীণাকেও ডেকে আনি'। বিজিৎবাবু কনিষ্ঠ ভ্রাতার দিকে ইঙ্গিতময় চাহনি দিতেই সুজিৎ চৌধুরী লজ্জায় লাল।

শক্তিপদ হাত দিয়ে কপালের চুল ঠিকঠাক করতে করতে বললেন, 'ঠিক আছে, সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি লাইন মশকো করছিলাম। কোথাও ছাপাতে দিই নি। আপনাদের শোনাই। অবশ্য পুরোটা মনে আছে কি জানি না, দেখা যাক।'

ঘরভর্তি শ্রোতা নিবিষ্ট চিত্তে শুনছেন শক্তিপদর একেবারে ভিন্নধর্মী কবিতাটি—

যে কেড়েছে বাস্তুভিটে, সেই কেড়েছে ভয়,
আকাশ জুড়ে লেখা আমার আত্মপরিচয়।
হিংসাজয়ী যুদ্ধে যাব, আর হবে না ভুল
মেখলা পরা বোন দিয়েছে একখানা তাম্বুল।
এবার আমি পাঠ নিয়েছি—আর কিছুতে নয়,
ভাষাবিহীন ভালোবাসার বিশ্ববিদ্যালয়।
বাংলা আমার আই-ভাষা গো, বিশ্ব আমার ঠাঁই
প্রফুল্ল আর ভৃগু আমার খুল্লতাত ভাই।

২৮

এতটা বয়স হল, প্রেমেন্দ্রবাবুর কোন ক্লান্তি নেই। টেবিলে পরিপাটি করা রাখা ফাইল থেকে একটা একটা কাগজ বের করেন আর খস খস করে চিঠি লিখে যান— মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক, সাহিত্য অকাদেমি। একটা টাইপ রাইটার থাকলে ভালো হত। কিন্তু বাংলায় লেখার কী হবে। শুনেছেন বৈদ্যুতিন টাইপ রাইটার এসে গেছে। কিন্তু আমাদের যুগ তো শেষ হয়ে এল। তবু ভালো, এখন জিরক্স মেশিন এসে গেছে। গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলো আর নিজ হাতে নকল করে রাখতে হয় না। কার্বন দিয়ে সব কাজ হয়ও না। আর, সাইক্লো কিংবা ডুপ্লিকেটর মোটেই সুবিধের হয় নি।

আজকাল বুঝতে পারেন বয়স হচ্ছে। শরীর এত ধকল সইতে পারছে না। সমস্ত অভিমান ঝেড়ে প্রেমেন্দ্রবাবু একদিন গেলেন সন্তোষমোহনের বাড়িতে। আসামচুক্তির বিরোধিতা না করায় সন্তোষমোহনের উপর প্রেমেন্দ্রবাবু খুবই অসন্তুষ্ট। একেবারে কোন বাঙালি প্রতিনিধি নেই, অথচ বাঙালিদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গেল এ চুক্তিতে। তাঁদের কি কোন দায়িত্ব ছিল না? তবে ত্রিপুরায় সিপিএমকে হঠিয়ে কংগ্রেস সরকার বসিয়ে দেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে সন্তোষমোহন দেব দেখা করতে গেলে উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপকো ক্যা চাহিয়ে?' সন্তোষমোহন এবার ভুল করেন নি। তিনি চাইলেন, 'সেন্ট্র্যাল ইউনিভার্সিটি ফর বরাক ভ্যালি'।

সত্যিই অবশেষে উননব্বুইয়ের 'মে মাসে কেন্দ্রীয় সংসদের দুটো কক্ষে আসাম ইউনিভার্সিটি এক্ট পাস হয়ে গেল'। সূচনায় যাঁরা এর বিরোধিতা করেছিলেন, এদের আস্ফালন, চেঁচামেচিতে সেদিন সংসদ উত্তাল হলেও রাষ্ট্রপতির দস্তখত হয়ে গেলে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

'এখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কেবল সময়ের অপেক্ষা', বললেন প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামী। কিন্তু সেদিন ভাগ্যদেবী অলক্ষ্যে হাসছিলেন। এরপর আরেক লম্বা দৌড় অপেক্ষা করছে-মুভমেন্ট ফর ইমপ্লিমেন্ট অব আসাম ইউনিভার্সিটি এক্ট, ১৯৮৯। এ নিয়ে সুজিৎ চৌধুরীর সঙ্গে প্রেমেন্দ্রবাবুর দীর্ঘ আলোচনা।

"আমাদের কোন প্রাপ্তিই সহজ পথে হয় না। এবার যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ছাত্ররা আরেকটি বায়না ধরল, বিশ্ববিদ্যালয়টি তাঁদের উপত্যকায় হোক। নয়তো তাঁদের জন্য আরেকটি হোক।'

'স্যার, এই nomenclature -এর মধ্যে একটা ব্যাপার রয়ে গেছে। আপনার প্রস্তাব ছিল 'পূর্ব ভারত বিশ্ববিদ্যালয়'। ওঁরা একটা প্যাঁচ রেখে দিয়েছে। নামটি সোজাসুজি শিলচর বা কাছাড় ইউনিভার্সিটি হলে এরকম কোন সমস্যা হত না বোধহয়।' চিন্তিত হয়ে বললেন সুজিৎ চৌধুরী।

'এই নিয়ে এখন আর চিন্তার কোন অবকাশ নাই রে বা।'

'স্যার আপনার উদারতার মর্যাদা দিল না এরা। আপনি যে ভাবনায় এ প্রস্তাব রেখেছেন, ওঁরা এ থেকে একটা রাজনৈতিক ফায়দা তুলে নিল। সেই যে মিল্টন লিখেছেন, out of good still to find means of evil. কী জানি আপনি কী ভাবে দেখছেন বিষয়টি।'

'বলো সুজিৎ, আমি শুনছি।'

'আমি বলি কি, এ বিলের খসড়াতে বরাক বিরোধী লবি কলকাঠি নাড়িয়েছে। আর দেখুন না আসাম বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ নিয়ে একটি প্রশ্ন তুললে বাঙালিদের গায়ে আসাম বিরোধী তকমা সেঁটে দেবে। এমনিতেই বাংলাদেশি, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী গাল তো আছেই।'

'না, তবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়ও এ নামকরণের বিরোধিতা হচ্ছে।'

'তা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের খুব রয়ে সয়ে কথা বলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়টি ফস্কে যেতেও পারে। বাহাত্তরে এরকম ঘটনার নজির রয়েছে। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়—এ নামে বিশ্ববিদ্যালয় তেজপুর নওগা যে কোন জায়গায়ই হতে পারে।'

'না, অতটা নয় পরিস্থিতিটি। দাঁড়াও তোমার জন্য মূল এক্টের একটা কপি করিয়ে আনাচ্ছি।'

'স্যার, আমি বলছি, ইন দ্যা লং রান, এই নামকরণটি আরেকটি সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ করে রাখছে।'

'তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না।'

'আপনি স্যার এরকম চিন্তা করছেন না, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি অনেক উদার। আপনি সবার সঙ্গে মিলে মিশে চলার পথিক।'

'বুঝছি, তুমি কি মনে কর বরাক উপত্যকা পৃথকীকরণের সম্ভাবনা বা প্রয়োজন আছে? হ্যাঁ, তখন তো এ নামকরণ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে।'

'বরাক উপত্যকাকে যতদিন অবাধে লুঠ করতে পারা যাবে ওরা ছাড়বে না। প্রয়োজন শেষ হলে বা সে রকম প্রতিরোধ করলে আসামের ক্যানসার বলে বের করে দেবে।

'তবে এ বিশ্ববিদ্যালয়, মানে এই নমেনক্লেচার কাছাড় পৃথকীকরণের পথে একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে যেমন ওঁরা চেয়েছেন।'

'স্যার, রাজধানী সরানো এক কথা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পাল্টানো আরেক কথা। আজ থেকে ত্রিশ বছর পরে কাছাড়ের মানুষ উপলব্ধি করবে উনিশ শো উননব্বুই সালে কী ভুল হয়েছে -'

'সুজিৎ, তুমি কি মনে কর কাছাড় পৃথকীকরণ অনিবার্য?'

'পরিস্থিতি তো তাই বলছে। কাছাড় তো কোনভাবেই আসামের সঙ্গে বিলগ্ন নয়। না ভৌগোলিক, না ঐতিহাসিক দিকে। প্রাদেশিক ঐক্যবোধ তো

নিতান্তই বহিরঙ্গ এক আবরণ। বিষয়টা খুব নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন ঐতিহাসিক হেড়ম্বকান্ত বড়পুজারী মহোদয়, ওই স্টেটসম্যান কাগজেই। এজন্য অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পত্রিকাটি পোড়ায়নি। আমি লিখলে পোড়াতো।'

'সে তো তুমি ঠিকই বলছ। কিন্তু কাছাড় কি মানসিকভাবে পৃথক হবার জন্য প্রস্তুত?'

'না তো। এখানেই সমস্যা। একটা সময় ছিল মুসলিমরা ভাবত সেপারেশন হলে এরা বিপন্ন হবে। এরপর আবার হিন্দুদের মধ্যে ভাবনা এল সেপারেশন হলে সমস্ত ক্ষমতা চলে যাবে মুসলিমদের হাতে। তাছাড়াও আছে গ্রাম শহরের বিভাজন।'

'এদিকে আবার আরেকটি বৈপরিত্য লক্ষণীয়, গ্রাম বলতে সবাই বোঝেন স্থানীয়, অর্থাৎ আদি বাসিন্দা, আর শহর বলতে এরাই বোঝান দেশ বিভাগ পরবর্তী শরনার্থী, মানে এদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনি জনমঙ্গল পরিষদ আর জনকল্যান পরিষদের বিপরীতমুখী মেমোরেন্ডামগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন।'

বৃদ্ধ মানুষটির মাথায় এতটা বোঝা চাবিয়ে দেওয়া কি ঠিক হল? সুজিৎ চৌধুরীর মনে হল এমনিতেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে বিব্রত। আদর্শবান স্বাধীনতা সংগ্রামী ধরেই নিয়েছেন, যাঁদের কথা ভেবে তিনি এতটা এগিয়েছেন, এরা সকল প্রলোভন প্রত্যাহার করে একই লক্ষ্যে অবিচল আছে।

২৯

সুজিৎ চৌধুরী সব কাজ ফেলে কয়েক দিন থেকে পড়ছেন একটি স্মারকগ্রন্থ। হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভার ৩৪ তম অধিবেশন উপলক্ষে প্রকাশিত। ওদের প্রতি ক্ষোভের কোন সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু আমাদের নিজের মানুষই যখন আত্মঘাতী হয়ে যেতে চান তখন কী করা উচিত?

স্বাধীনতা সংগ্রামীর পুত্র, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উচ্চশিক্ষিত ভ্রাতা যখন এই গ্রন্থে প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ করতে লেগে যান 'অসমিয়া, সিলেটি আর কাছাড়ি মূলত

এক ভাষা— তখন অবাকই হতে হয়। এসব লোকের প্রশ্রয় পেয়েই কনক সেন ডেকার মতো ব্যক্তিরা বলেন 'কাছাড়ের স্থানীয় ভাষা বাংলা নয়।'

দুপুরবেলা অনুজপ্রতীম গবেষক সুবীর করের সঙ্গে ফাইল খুলে বসেছেন সুজিৎবাবু।

'সুজিৎদা, এসব রাবিশ তুমি ছুঁড়ে ফেলে দাও। তোমার তো আরও কাজ রয়েছে। এ নিয়ে বসে থাকলে শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস আর এগোবে না।'

'না রে, সুবীর, এ চক্রান্তটা মোটেই উপেক্ষার নয়। ওঁরা তো আমাদের জাতিসত্তার উপর আঘাত হানছে। এই দ্যাখ, সত্যপ্রসাদ বরুয়া কী লিখেছেন ট্রিব্যুনে।'

'মানে নাট্যকার সত্যপ্রসাদ?' এই যে হাইলাকান্দি অধিবেশনে বিশেষ সম্মান প্রদান করা হয়েছিল সেই ব্যক্তি।

'হ্যাঁ, বল, তোর বিশেষ পরিচিত। না ঘনিষ্ট বন্ধু?'

'সুজিৎদা, সত্যিই আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে। তোমার সঙ্গে নেই জেনে আশ্চর্য হচ্ছি।'

'অত আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমি তো আর জনসংযোগ অফিসার নই। দ্যাখ তোর বন্ধু ওঁর কলাম, Cyclorama-তে কী লিখেছেন। এসব লেখা তোদের চোখ এড়িয়ে যায় কী করে বলতো?'

'ইনি হাইলাকান্দি এসে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে স্থির হয়েছেন এদের মুখের ভাষা বাংলা নয়'।

'মানে অসমিয়া?'

'না, অনেকটাই অসমিয়া। ইনি আমাদের সুসন্তানের মতো এতো গাড়োল নন, পেটে বিদ্যা আছে হে, ঘটে বুদ্ধিও।'

'না, সুজিৎদা এত মিথ্যাচার!

“আরে পুরোটা শোন না—লিখেছেন- আমি বাংলা করে বলছি—‘আমি যখন তাদের বললাম যে বাংলা তাদের নিজস্ব ভাষা নয়, তারা তাদের বাড়িতে বাংলা বলে না, এবং তারা আসলে যে ভাষায় কথা বলে তা বাংলার চাইতে আলাদা, এবং এই ভাষাকে বরাকী নামে অভিহিত করা যায়, তখন তারা ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করেছে বলে মনে হল। --এখন অসম সাহিত্য সভার দায়িত্ব হচ্ছে কম দামের কিছু বই প্রকাশ করার পরিকল্পনা তৈরি করা, যে বইগুলো অসমিয়া ভাষায় নয়, রচিত হবে বরাক উপত্যকার কথ্য ভাষায়। মাঝে মাঝে কিছু অসমিয়া অনুচ্ছেদ তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। --আমার মনে হয় তাদের কথ্য ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেই তারা আমাদের কাছা কাছি আসবে।’

‘সুজিৎদা আর পড়ার দরকার নাই। আমার মাথা ঘুরছে। কী ভীষণ চক্রান্ত!’

সুজিৎ চৌধুরী বললেন ‘এই নাট্যকার একটি পরিভাষা কয়েন করেছেন, --বরাকী ভাষা। বাংলার মতো, তবে বাংলা নয়, অসমিয়ার মতো তবে অসমিয়া নয়।’

‘তাই তো, এই বরাকী ভাষার কথাই বলছেন আমাদের মন্ত্রী মহোদয়’, বললেন সুবীর কর।

“এই হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক চরিত্র। নিজের ভাষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষমতায় থাকার প্রাণান্তকর প্রয়াস।

‘এই দেখ শহিদুল আলম সাহেবের বিবৃতি- প্রকৃতপক্ষে গ্রাম্য মানুষেরা যে ভাষা ব্যবহার করেন তা বাংলা নয়। ভাষাটিকে কাছাড়ি, সিলেটি বা অন্যকোন নাম দেওয়া যায়। অসমিয়া আর বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে ওই ভাষা গড়ে উঠেছে।’’

সুবীর কর, ‘ভাষার সংমিশ্রণের আগে তো প্রয়োজন জনসংমিশ্রণ। সেটাই হল না, আর ভাষা তৈরি হয়ে গেল। শহিদুল ইসলাম কাছাড়ের উপভাষা নিয়ে পলিটিক্স করছেন পঞ্চাশ ষাট বছর আগে যার সূচনা করে গেছেন বেণুধর রাজখোয়া-Notes on Sylheti Language পুস্তিকায়।’

'শোন, শহিদুল আলম সাহেবের সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের মতো জটিল বিষয় নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া পণ্ডশ্রম এবং বিড়ম্বনা মাত্র।'

তবে শুধু তিনিই যদি এরকম কথা বলতেন তবে এতটা আশঙ্কার কারণ হত না। সঙ্গে যে একাধিক পণ্ডিতম্মণ্য ব্যক্তিও আছেন। বুঝলি আমাকে একটা বইই লিখতে হবে। এই সব ঔদ্ধত্য আর কত বরদাস্ত করা যায়? 'সুবীর কর স্থির হয়ে শুনছেন,

''কী সদম্ভ ঘোষণা— আমি অনুবাদ করে বলছি,

'আমরা আশা করছি যেহেতু রাজ্যভাষা আইনে বরাক উপত্যকায় অসমিয়া ভাষার প্রবেশ রুদ্ধ করা হয়নি, তাই অচিরেই হাইলাকান্দিকে জেলা পর্যায়ে উন্নীত করার ব্যবস্থা হোক।''

'ওরে বাবা! কোন রাখঢাক নেই। চক্ষুলজ্জাও নেই। আর এই সম্মেলনকে সফল করে তুলতে আমাদের কবি-সাহিত্যিকের সেই কী ব্যাকুলতা। দলে দলে আলগাপুরে যাওয়া-- যেন তীর্থদর্শনে যাচ্ছেন। ওখানে যে নিজের মাতৃভাষার বিরুদ্ধে চলছে চক্রান্ত।'

'শুধু কবি-সাহিত্যিকদের দোষ দিচ্ছিস কেন? একটা লিফলেট বেরিয়েছিল না বরাক উপত্যাকার ভাষিক স্বাতন্ত্র রক্ষা করা এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষার আবেদন জানিয়ে।'

'হ্যাঁ, আমরা তো দস্তখত দিয়েছি।'

'প্রথম দফায় অনেকেই দিয়েছেন। কিন্তু এরপর কাগজে চিঠি লিখে নাম প্রত্যাহারের কী হিড়িক পড়েছিল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কারা কারা যেন ছিল?'

'থাক থাক, তোমার আমার অনেক প্রিয়ভাজনও আছেন এতে। শোন, যারা ভয় পায়, এরা নিজের ছায়া দেখেও ভয় পায়। সমস্যা হল, এরাই যে আমাদের বুদ্ধিজীবী। থাক এসব কথা। আমি তোকে একটা জিনিস দেখাই।'

এই বলে আরেকটি কাগজ বের করে বললেন, “এই দ্যাখ আরেক মহাজন বলছেন—

“কছাৰত মানুষ থকা হলে, অসমত মানুহ থকা হলে আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ গা'ত জোৰ থকা হলে এই পুতৌ লগা অৱস্থা নহল হেতেন।”

সুবীর করের বিমূঢ় অবস্থা দেখে সুজিৎ চৌধুরী মুখ খুললেন, ‘শোন এবার আমি বলি, এখন কাছাড়ে শহিদুল আলম চৌধুরীর মতো মানুষ হয়েছেন, আসামে আছেন সত্যপ্রসাদ আর পবনকুমারের মতো মানুষ, সাহিত্য সভার গায়ে পর্যাপ্ত পরিমানে জোর সঞ্চিত হয়েছে, অতএব বরাক উপত্যকা সম্পর্কে এ ধরনের ষড়যন্ত্রজাল এখন প্রকাশ্যেই রচনা করা সম্ভব হচ্ছে।’

সুবীর কর এসব শুনে একেবারে মিমূঢ়।

‘বস, এক্ষুণি আসবে কামাল। ওঁর জন্য রয়েছে আরও খবর। তবে তুই তো মধ্যযুগের পুথিপত্র, ভাষাতত্ত্ব নিয়েও ঘাঁটাঘাঁটি করিস। দাঁড়া, দেখ তো কামাল দরজায় কড়া নাড়ছে।’

বলতে বলতেই হাজির কামালউদ্দিন আহমেদ। করিমগঞ্জ কলেজে ইতিহাস পড়ান। প্রশস্ত কপাল, সুঠাম দেহ, চোখে রিমলেস চশমা। ইতিমধ্যে মধ্যযুগে কাছাড়ের স্থাপত্য নিয়ে একটি গবেষণা কর্মও শেষ করেছেন।

‘শুনোরে বা, সুজিৎদা, আমরারে তো কোণঠাসা করি লাইত এরা। তবে এর আগে শেষ করি, যে কাজে তোমার কাছে আসা।’

‘না, না, আগে আমার কথা শুন। এতক্ষণ সুবীরের সঙ্গে এ নিয়েই আলোচনা। বল তো দেখি খাসপুর লিপির ভাষা যে বাংলা এ নিয়ে কোন সন্দেহ আছে? তুই তো এ লিপি নিয়ে বিস্তর কাজ করেছিস।’

‘ও হো, সেই পেট কাটা র-র প্রসঙ্গ। মানে -।’

‘হ্যাঁ, ডিমাসা কাছাড়ি রাজাদের আমলের দুটি প্রস্তরফলক আর কয়েকটি নথিতে এই পেট কাটা র ব্যবহৃত হয়েছে। এতেই নিরূপমা হাগজের, পরাগকুমার দাস এবং রামচরণ ঠাকুরীয়া একেবারে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন বরাক উপত্যকায় মধ্যযুগে আসমিয়া ভাষা প্রচলিত ছিল।’

'ধ্যৎ, তা হলে মধ্যযুগের সমস্ত বাংলা পুথিই যে আসমিয়া বলে দাবি করবেন এরা। মঙ্গল কাব্য, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন পুথি সর্বত্রই পেট কাটা -র। কিতা বা, মাত না কেনে সুবীর। এই সব তো তোমার বিষয়।'

'শুনো, বয়ের নীচে ফুটকি দিয়ে -র বানানোর কৃতিত্ব তো শ্রীরামপুর মিশনের প্রিন্টিং প্রেসের। কেরি সাহেবের একজন মিস্ত্রী ছিল পঞ্চানন কর্মকার। ওই ব্যাটাই ধাতু দিয়ে লেটার তৈরি করতে গিয়ে ব-এর নীচে ফুটকি দিয়ে কাজটি সিমপ্লিফাই করে দিয়েছে। তাই তো মুদ্রিত গ্রন্থে এই ফুটকি দেওয়া -র। এখনও অর্থাৎ অর্বাচীন হস্তলিখিত পুথিতে বুড়োরা এই অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারেন নি। সুজিৎদা, তুমি কোনও বৃদ্ধ আচার্যি ঠাকুরকে দিয়ে কোষ্ঠী তুলিয়ে নাও দেখবে তোমার চৌধুরীরও পেট কাটা যাবে।'

'তোমরা প্রমোদ ভাট্টাচার্যের কাণ্ড তো দেখনি। তিনি আরও এককাঠি সরেস, একেবারে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে ১৭৩০ সালে সুরদর্প নারায়ণের সভাকবি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি রচিত 'নারদীয় রসামৃত'র ভাষার বাঙালিত্বই খারিজ করে দিয়েছেন।'

'সত্যি?'

'এ পণ্ডিতপ্রবর বাচস্পতির কয়েক ছত্র উদ্ধার করে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন এটা আসমিয়া বাক্য।'

'দেখি।'

'এই তো, আমি পড়ি—

প্রণমহু ভূমিপতি লক্ষ্মীঠাকুরানী
বিষ্ণুর বল্লবা কামদেবের জননী
ক্ষিরদ তনয়া দেবি ভকত বৎসলা
না বুঝিয়া মূঢ় লোকে বলে ত চঞ্চলা।'

সুবীর, 'এটা তো পিওর বাংলা। এখানে অসমিয়া ভাষার লক্ষণ কোথায়?'

'জিজ্ঞেস করো গিয়ে তোমার প্রমোদবাবুকে। এই কবিতার শেষ বাক্যে 'না বুঝিয়া' শব্দবন্ধের প্রয়োগটিই লেখকের সিদ্ধান্তের উৎস।'

কামালউদ্দিন বললেন, 'বুঝেছি মই না-খাম, না -যামের সঙ্গে মিলিয়েছেন ব্যাপারটি। তাঁকে তো প্রমাণ করতেই হবে যেন তেন প্রকারেণ।'

"শোন, এটা তো সর্বৈব সত্যি, বাংলা গদ্যে নেতিবাচক 'না' সাধারণত ক্রিয়াপদর পরে বসে এবং অসমিয়ায় নেতি বাচক শব্দটি বসে ক্রিয়াপদর আগে।"

সুবীর কর 'কিন্তু' বলে উঠতেই সুজিৎবাবু থামিয়ে দিলেন, "তোরা তো কবিতা পড়াস, কবিতা লেখার হাত তোদের দুই জনেরই আছে। কী রে কামাল, কবিতা ছেড়ে দিয়েছিস কি? লক্ষ্য করেছিস বাংলা কবিতায় যে নেতিবাচক 'না' ক্রিয়াপদর আগে অহরহই বসে? অবশ্য এ খবরটি শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য নেননি। নিলে ভালো করতেন, নইলে খোদ রবীন্দ্রনাথও নেতিবাচক 'না' ক্রিয়াপদর আগে ব্যবহার করার সুবাদে সমজাতীয় সিদ্ধান্তের শিকার হয়ে যাবেন।"

সুজিৎ চৌধুরীর হাসি হাসি মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। দুজন শ্রোতা জানেন এখন তিনি বলেই যাবেন আন-ইন্টারাপ্টেড।

"তোরা তো রবীন্দ্রনাথ পড়িস। দ্যাখ, এ পঙক্তিগুলো কারও অজানা নয়- 'কেহ নাহি জানে কার আহবানে', 'নাহি নিন্দে বিধাতারে'; গান শুনিসনি সেই যে 'আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে', 'না- চাহিলে যারে পাওয়া যায়'!

করিমগঞ্জে শহরে থানা রোডে সুজিৎ চৌধুরীর আসাম টাইপের পুরনো বাড়ির দেওয়ালের বুড়ো টিকটিকিটি কী জানি কী বুঝে এবার বেশ মোটাস্বরে হেসে উঠল, 'টিক টিক টিক'। অতঃপর ঘরময় দীর্ঘ নীরবতা।

সুজিৎ চৌধুরী বলে চলেছেন 'এমনকী, যে দুটি শব্দপ্রয়োগের জন্য কাব্যরচনার আড়াইশত বৎসর পরও বাচস্পতিমশাইয়ের রেহাই মিলছে না, সেই 'না বুঝিয়া' শব্দ দুটিও চলিত রূপে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেনঃ না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে।'

শেষ বাক্যটি বলতে বলতে সুজিৎ চৌধুরীর গলা বন্ধ হয়ে গেল, চোখে এসে গেল জল, 'এই না বোঝাটা কার আমি জানি না, আঁখিজলে অবশ্য আমরাই ভাসছি আজ।'

রীনা চৌধুরী চা দিতে এসে দেখেন তিন বন্ধু শিশুর মতো কাঁদছেন। পাছে এরা বিব্রত হন তাই নিঃশব্দে ট্রে হাতে ফিরে গেলেন।

৩০

বরাকের ভাগ্যটাই কি এরকম? কোন কিছুই সহজে হবার নয়। এটা দেখি প্রকৃতই এক নির্বাসিত, অভিশপ্ত ভূমি। বৈঠকখানার নির্জন ঘরে বসে বসে তাই'ই ভাবছেন প্রেমেন্দ্রমোহন। মনে এল কবিগুরুর সেই পঙক্তি -

মমতা বিহীন কালস্রোতে
বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি।

আমাদের নৌকাটা বার বার তীরে এসে ডুবে যেতে চায়। যেই না ইন্দিরা গান্ধীকে রাজি করিয়ে নিচ্ছিলাম, ঠিক তক্ষুণি তিনি চলে গেলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন খেল বিরাট ধাক্কা।

এ অধ্যায় পেরিয়ে আমরা আবার ফিরে দাঁড়ালাম। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনও পাশ হল। কিন্তু এটা বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেই। মনে আছে সেদিনের কথা-- আমরা প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম কুম্ভিরগ্রাম বিমানবন্দরে। তিনি যাচ্ছিলেন আইজল। আমরা মনে করিয়ে দিলাম তাঁর মায়ের প্রতিশ্রুতির কথা। তিনি আমাদের স্মারকপত্রটি শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করলেন। এর দুই বছরের মাথায় বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাশ হল। কিন্তু পরবর্তী কাজ আর শেষ করে যেতে পারলেন না। তিনিও মায়ের মতো প্রাণ হারালেন। আমরা পড়লাম আরেক দীর্ঘ প্রতীক্ষায়।

যতদিন যাচ্ছে নানা ধরনের কানাঘুষাও শোনা যাচ্ছে। লোক্যাশন নির্ধারণ নিয়ে একটা টানা হ্যাঁচড়া তো আছেই, উপাচার্য হিসেবে কা'কে স্থির করা হচ্ছে কে জানে। এ উপাচার্যের উপরই নির্ভর করবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ। একটা একটা নাম ভাসে হাওয়ায়, দিন কতক চর্চা চলে, এরপর আসে আরেকটি নাম। তবে সবাই চায় এমন একজন ব্যক্তি আসুন যিনি এ অঞ্চলকে ভেতরে বাইরে চেনেন, এখানকার সমাজ-ইতিহাস-লোকজন-অর্থনীতি ঐতিহ্য সম্বন্ধে

ওয়াকিবহাল। একেবারে অপরিচিত কোনও ব্যক্তির হাতে আমাদের দীর্ঘদিনের আশাআকাঙ্ক্ষার ফল এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব দিয়ে কি আমরা নিশ্চিত হতে পারি? সেই উনিশ শো চব্বিশে আসাম আইন পরিষদে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর ভাষণ, ছেচল্লিশে সুনীতিকুমারের শিলং ভাষণে যে স্বপ্নের অঙ্কুরোদ্গম, তা'ই আজ চারা হয়ে মাথা তুলেছে। এর পেছনে রয়েছে উনিশে মে'র একাদশ, বাহাত্তরে দ্বাদশ, পঁচাশিতে জগন্ময়-জিসুকে নিয়ে চতুর্দশ শহিদের আত্মবলিদান। এত কিছু ভাবতে ভাবতে বৃদ্ধ লোকটির চোখ ঝাঁপসা হয়ে হয়ে গেল।

আজ সকাল থেকে তাঁর মনটি খারাপ। ওঁরা তাঁকে জানায় নি, দুদিন আগে তাঁর প্রিয়জন সুজিৎকে পুলিশ নিয়ে থানায় লক-আপে পুরে অকথ্য অত্যাচার করেছে। এই বয়সে এতটা ধকল সে কী করে সইবে? কী ক্ষতি সে করতে পারে হে তোমাদের? তাঁকে আঘাত মানে বরাকের বাঙালি জাতিসত্তার উপর আঘাত। তাঁর কাছে তো কোনদিন ঘৃণা বিদ্বেষের চিন্তা প্রশ্রয় পায়নি। এরা কি জানে না বঙ্গসাহিত্যের সম্পাদক সুজিৎ চৌধুরী এসময়ে এই দেশের অন্যতম সমাজবিজ্ঞানীও। তোমরা ওঁসবের খবর রাখো না এটা তোমাদের দুর্ভাগ্য। দেশে কি জঙ্গলের রাজত্ব চলছে? হায় হায়, এসব দেখার জন্য কি এত দিন বেঁচে আছি?

দেখতে দেখতে চোখের সামনে কত কি যে ঘটে যাচ্ছে। দেশ উত্তাল হয়ে গেল নতুন উন্মাদনায়। হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষে সারা দেশ ছেয়ে গেল। এর আঁচ লেগেছে আমাদের এ উপত্যকায়ও। মানুষের মাথায় যেন আর কিছুই নেই। পুরনো এক মসজিদ ভেঙে মন্দির হবে। কে এই লোকগুলোকে শান্ত করবে? আমাদের ঘরে বাইরে সংকট। এর মধ্যে যদি ধর্মীয় বিদ্বেষে গা ভাসিয়ে দিই আমরা তবে তো সমূহ বিপদ। কিন্তু কা'কে বোঝাবো? শিক্ষিত জনেরা যদি মনের মধ্যে বিদ্বেষ পোষে রাখেন সেটা তো কিশোর যুবকদের মনে সঞ্চারিত হবেই। আজকাল প্রাত্যহিক কথাবার্তা, সভাসমিতি মিটিং মিছিলে মানুষের মুখের লাগাম নেই। বরাকের আকাশে বাতাসে উড়ছে বিদ্বেষ জাগানো লিফলেট, প্রকাশ্য রাস্তায় কারা যেন টাঙিয়ে দেয় হুমকি। এই ঘৃণার দর্শন যদি নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ত্রিশ বছরের মধ্যে পরিবেশ কী হবে ভেবে প্রেমেন্দ্রমোহন শিউরে উঠেন। আমাদের আর কত দিন, কিন্তু এদের কোন পৃথিবীতে রেখে যাব? রোদে

ভরা উঠোনে খেলছে তাঁর ছোট্ট নাতনি। হঠাৎ মনে হল শিশুটিকে জড়িয়ে ধরি। তিনি হাতের কাগজপত্র রেখে নেমে গেলেন নাতনির দিকে। মনে হল এদের জন্য আরও কিছুদিন বেঁচে থাকি। মনে মনে প্রার্থনা করলেন হে ভগবান, তুমি আমাদের অনেক দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেছো। এদের জন্য রেখো এমন একটা পরিবেশ যেখানে কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা বিদ্বেষ ঘৃণার স্থান থাকবে না।

৩১

একুশে জানুয়ারি উনিশ শ চৌরান্নব্বুই। আজ পুরো বরাক উপত্যকা কেমন নিস্প্রভ। কারা যেন ডেকেছে বন্ধ। আবার কারা নেমেছে এর বিরোধিতায়। এও কি আরেক চক্রান্ত! ছাত্র যুবকের দল কত প্ল্যান করেছিল এ দিনটিকে নিয়ে। কিন্তু হায় ইলেকশন কমিশনার টি এন শেষণ কী এক নোটিশ জারি করে দিলেন, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাবিত আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস করতে পারবেন না। নির্বাচনবিধি বাঁধ সাধছে।

মাথায় বাজ পড়েছে ইস্পাতমন্ত্রী সন্তোষমোহনের। তিনি তিনদিন তিন দিন আগে থেকেই শিলচরে ক্যাম্প করে আছেন। পি ভি নরসিম রাও মহোদয়কে অভ্যর্থনা জানাবেন নিজ শহরে। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি রাখছেন না। কিন্তু সমস্তকিছুই যে পণ্ড হতে চলেছে। কে ডেকেছে বন্ধ, কাদের বিরুদ্ধে এ বন্ধ, যারা পথে নেমেছে এরাও জানে না এদের অভিযোগ কার বিরুদ্ধে। তবে আপাতত সবার রাগ গিয়ে পড়েছে ওই অদ্ভুত খেপাটে লোকটির উপর। বরাক বাসীর দীর্ঘ দিনের এই প্রতীক্ষা। সব কিছুই যেন থমকে দাঁড়ালো। দ্যাখা যাক ওঁরা কী উপায় বের করেন। মুখ্যমন্ত্রী নাকি বলেছেন অনুষ্ঠান যথারীতি হচ্ছে। চিন্তার কোনও কারণ নেই। বিগত দিনগুলোতে এই হিতেশ্বর সইকিয়া কীই না করে যাচ্ছেন।

তবে প্রস্তুতি চলছে ঠিক মতোই। বিশ্ববিদ্যালয় সাইটে পাহাড় কেটে হ্যালিপেড তৈরি হয়েছে, তৈরি হয়েছে অস্থায়ী সভাস্থল। যুদ্ধকালীন তৎপরাতায় রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ, জল, সাজসজ্জা সবই হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী আসবেন খুব অল্প সময়ের জন্য। এখান থেকে তাঁকে যেতে হবে তেজপুরে। আজ একই দিনে দু দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলা--!!

না না, শিলান্যাস তো বলা যাবে না। অসুবিধে আছে। তবে কিছু একটা হবে আরকি। একদিকে আছেন দক্ষিণভারতীয় চাণক্য, আর আরেক দিকে আছেন হিতেশ্বর মহোদয়, উপরে আছেন ঈশ্বর।

আবার প্রমাণিত হল, বরাক উপত্যকায় কোন কিছুই এত সহজে পাওয়ার কথা নয়। রাগী ছাত্র নেতাদের শান্ত করতে গত বছর তেজপুরের জন্য দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল পাশ না হওয়া পর্যন্ত আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইল লাল ফিতেয়ই বাঁধা রইল। যাও শেষ পর্যন্ত গেরো খুলল, এবার আবার কী হ্যাপা।

সকাল থেকে প্রেমেন্দ্রমোহনের মনটা বিমর্ষ। এরকম তো হবার কথা ছিল না। আজ তো আমাদের উৎসবে মত্ত হবারই কথা। কিন্তু কারও মনে কোন উৎসাহ নেই। ছাত্র সমাজেও নেই কোন উচ্ছ্বাস। সর্বত্রই কেমন ছত্রভঙ্গ দশা।

গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে প্রেমেন্দ্রমোহন বাড়ির চত্তরে পায়চারি করছেন। ইচ্ছে হল এক্ষুণি রাস্তায় বেরিয়ে যান সবাইকে নিয়ে। পৌঁছে যান দরগাকোণায়। আজ কত আনন্দের দিন।

ফিরে এলেন বারান্দায়। টেবিলে পড়ে আছে একটি পাণ্ডুলিপি। আজই এটা পড়ার দিন। পাঠিয়েছেন সুজিৎ চৌধুরী সিমলা থেকে। আগামী মাসে শিলচরে বঙ্গসাহিত্যের চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশন স্মারকগ্রন্থের জন্য। বিষয় আমাদের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর ভেতর একটা চাপা অভিমান রয়েছে। আজ তো এখানে থেকে উৎসবে সামিল হবার তাঁরও তো কথা ছিল।

পুলিশি নির্যাতন তাঁর শরীর মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু তবুও এ অঞ্চলের ইতিহাস লিখে চলেছে। সিমলায় এক প্রকল্প নিয়ে সে কাজ করছে উত্তরপূর্বে জনবিদ্রোহ আর জনজাতির ইতিহাস নিয়ে। বলেছিল বড়োজাতির ইতিহাসও লিখবে। লিখুক। কারো উপর অভিমান করে হাত গুটিয়ে বসে থাকাটা কোন কাজের কথা নয়। আর বড়ো জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তো ফেলে দেওয়ার নয়। এই তো ক'বছর আগে এরা এসেছিল একটি বহুভাষিক অভিবর্তনে। সবাই মিলেই তো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা আসামের সংখ্যালঘু সব ভাষিকগোষ্ঠীর বিকাশের স্বার্থে বরাক উপত্যকায় স্থাপন হোক কেন্দ্রীয়

বিশ্ববিদ্যালয়, এতে সবার সমান ভাষিক অধিকার থাকবে। সুজিতের লেখা বড়োদের ইতিহাস তো সেই ঋণশোধের একটি প্রয়াসও হতে পারে।

তাছাড়া একাদশ শহিদের রক্তের বিনিময়ে যে মাতৃভাষার অধিকার আমরা পেয়েছি এ অধিকার তো বড়ো জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আমরা ভাগ করে নিয়েছি।

প্রেমেন্দ্রমোহন দেখছেন বাড়ির ঘাটা খুলে ভেতরে আসছে তাঁর এক প্রিয়ছাত্র। এর উপরই ভার পড়েছে সম্মেলনের পত্রিকা সম্পাদনার। সেদিন এরই খবরে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। দরজা ঠক ঠক করতেই বেরিয়ে এল দুই আড়াই বছরের ছেলেটি।

'তুমি কে?'

'আমি প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামী, তোমার নাম কি দাদুভাই?'

'শাশ্বত।'

'তোমার বাবাকে ডাক'।

'বাবা তো বাড়িতে নেই'। বৃদ্ধ ব্যক্তিটিকে ডেকে নিয়ে ঘরে বসিয়ে দিল। মাথার উপর পাখাটি চালিয়ে দিলে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে স্বস্তি পেয়ে তিনি বললেন 'এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারবে?' সেদিন তিনি খুব তৃপ্তির সঙ্গে জলটুকু নিলেন। বাবা ফিরে এলেই পুত্র জানালো, 'বাবা, প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামী এসেছিলেন, তোমার সঙ্গে খুব জরুরি কাজ। তুমি ওঁর বাড়িতে যাবে।' ইদানীং প্রেমেন্দ্রমোহন কাজে অকাজে এরকম এর ওর বাড়িতে হানা দেন। বোধহয় শিশুদের দেখে আসেন এদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে আসেন। এদের বাবাদের সঙ্গেও তিনি এমনি করে ভাব জমিয়েছিলেন অনেক দিন আগে।

'ভালই হয়েছে তুমি এসেছো। ওঁদিকের খবর কী?'

'স্যার গাড়ি ঘোড়া ঠিক মতো চলছে না। শুনেছি হ্যালিকপ্টার ল্যান্ড করেছে। অনুষ্ঠনিক ভাবে তো ফাউন্ডেশন স্টোন স্থাপন হবে না। সন্ধ্যাবেলা দূরদর্শন নিউজে সব দেখা যাবে। তবে এরই আগে রেডিওতে একটা স্পেশাল বুলেটিন যাবে শুনেছি।'

'তোমার পাঠানো সুজিৎ চৌধুরীর নিবন্ধটির পাণ্ডুলিপিটা শেষ করে এনেছি। আজই নিয়ে যেও। আজ তোমাকে কয়েকটি অংশ পড়ে শোনাচ্ছি। এই লেখা তো আজই পড়ার দিন। এত তথ্যপূর্ণ, চিন্তাশীল নিবন্ধ অনেক দিন পড়িনি। দাঁড়াও আমি চশমাটা পরে নিই,' বলে পাণ্ডুলিপিটি চোখের সামনে তুলে ধরে নির্বাচিত অংশটি পাঠ শুরু করলেন—

'যে বিশ্ববিদ্যালয় আমারা অর্জন করেছি, তাও একটি দীর্ঘস্থায়ী ধারাবাহিক আন্দোলনের ফসল।'

'স্যার সঠিক ভাবে কতদিনের আপনাদের এ আন্দোলন?'

'আহা। এ সব উত্তরই এখানে পাবে। আমরা মাঠে নেমেছি বলতে গেলে সেই বাহাত্তরের ভাষা আন্দোলন থেকেই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়-ভাবনার শুরু সম্ভবত কুড়ির দশকে ফার্স্ট রিফর্ম কাউন্সিলে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর উত্থাপিত একটি প্রস্তাব থেকেই। তখন সিলেট ছিল আসামের একটি জেলা। তাছাড়াও ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এর প্রাথমিক ভাবনাটা শুরু করে গেছেন। সেইটাও স্বাধীনতা বা দেশভাগের আগে। এসব তুমি এ নিবন্ধে পাবে। তুমি বোধহয় পাণ্ডুলিপিটি পড়োনি?'

'না, স্যার আমি তো পেয়েই আপনাকে দিয়ে দিয়েছি।

''ঠিক আছে, এবার শোনো,

> 'যে শোভন সুন্দর প্রক্রিয়ায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে সঙ্গতভাবে অর্জন করা যায়, বরাক উপত্যকার মানুষ তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। যাঁরা বাঁধা দিয়েছেন, আমাদের অর্জনে বাঁধা দিতে পারেননি বলেই তাঁরা হেসে গেছেন, তা নয়। তাদের পরাজয়টা অন্যত্র; তাদের বাঁধা দানের প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমাদের অর্জনের প্রক্রিয়ার যে পার্থক্য গুণগত, সেখানেই তাঁরা হেরে গেছেন।'

এটুকু পড়তে পড়তে প্রেমেন্দ্রমোহনের মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

'আজ এতক্ষণে আমাদের প্রধানমনন্ত্রীজির বিমান তো তেজপুরে পৌঁছে যাওয়ার কথা। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো আমাদের এখানে ওই তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও কেউ উচ্চারণ করে নি।'

'কিন্তু স্যার, ওঁরা মরিয়া হয়ে প্রতিরোধ করেছে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। পার্লামেন্টে সেদিন বিজয়া চক্র—'

'আহা হা। আজকের দিনটা এ প্রসঙ্গটা থাক না বাবা।'

'স্যার, আমার হাতে আসামের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী গোলক রাজবংশী মহোদয়ের একটি নোটসের প্রতিলিপি আছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে পাঠানো ওই নোটে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি general type with masters degree and research programme in traditional disciplines করার সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু তেজপুরের কথা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে, we should put more stress on programmes which are specifically geared to prepare the young generation to a vastly changing world of the next century.

স্যার ওই বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আরো বলা হয়েছে ... 'the aims should be to create a pace setting centres of excellence not only for the northeast but for the entire country'. এই দেখুন না স্যার কাগজটা।''

'থাক, আজকের দিনটা এসব কথা থাক। রেখে দাও এ কাগজ তোমার পকেটে' বলে তিনি অনেকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন। যেন ধ্যান করছেন।

ভেতর থেকে দু কাপ চা এলে যেন তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল।

'আমি তোমাকে চট করে আরো কিছু অংশ পড়ে শোনাই' বলে কাগজটি হাতে নিলেন।

'অর্জন করার পর একটা জিনিসকে গড়ে তুলতে হয়, সর্বত্র সেই গড়ে তোলার কাজটা হয়ে ওঠেনি। তেমন ভুল যেন আমরা না করি'। এই শেষ প্যারাগ্রাফটি বোল্ড লেটারে দিতে পারা যায় কি না দেখো—

সকলেই জানেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বরাক উপত্যকার বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু তার নাম আসাম বিশ্ববিদ্যালয়। আর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে তা সর্বভারতীয়ও বটে। সেই সঙ্গে বিশ্বের অনুষঙ্গ তো তার ধারণার মধ্যেই অন্তর্লীন। খণ্ডের গণ্ডিতে থেকেও পর্যায়ক্রমে অখণ্ডের পথে যাত্রা করার উপাদান তো জন্মলগ্নেই সে বহন করছে। পথের পাঁচালীর অপু জন্ম নিয়েছিল অজ পাড়া-গাঁ নিশ্চিন্দিপুরে–নিজের সাধনায় সে পরিণত হয়েছিল বিশ্বনাগরিকে। প্রত্যন্ত এই উপত্যকা আর সংলগ্ন পার্বত্য এলাকার যদি সাধনার জোর থাকে, তবে বিশ্বকেই অর্জন করতে পারবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে। বিশ্ব তো ভ্রমণে অর্জিত হয় না, অর্জিত হয় মননে-চিন্তনে, সেই মনন-চিন্তনের কেন্দ্র হিসেবেই যেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে।”

৩২

এদিকে যখন গুরুশিষ্যের মধ্যে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়চর্চা, তখন দরগাকোণায় প্রধানমন্ত্রীর আকাশযান অবতরণ করে ফেলেছে। টি এন শেষণ সাহেবের ভয়ে আজ শাসকদলের অনুগামীদের তেমন কোন অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি নেই যেমনটি তাঁরা সচরাচর করে থাকেন। ছাত্র সংস্থাও সংযত। সুরক্ষা বলয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে অনুষ্ঠান মঞ্চের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন সন্তোষমোহন দেব।

প্রধানমন্ত্রীর অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর সইকিয়া। তাঁরও অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণ নয়, কথনই বলা যায় --। অসমিয়াতে নয়, সুস্পষ্ট বাংলাতেই– 'আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়ে গেল-- আজ থেকেই। আর কেউ এ বিশ্ববিদ্যালয়কে আটকাতে পারবে না--।'

এরই মধ্যে ইতিহাসবিদ প্রফেসর জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্যকে আহবান করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেবার ব্যাপারটিও কেমন যেন খাপছাড়া। শ্রোতারাও বেশ আশাভঙ্গ হলেন।

কোনও জ্ঞানগর্ভ কথা নেই, নেই কোন মহৎ আদর্শের কথা—এরকম অনুষ্ঠানে নিয়ম রক্ষার জন্যেও সচরাচর যা হয়ে থাকে। শ্রোতাদের মধ্যেও এ

ঘোষণায় কোন প্রতিক্রিয়া নেই। খাপছাড়া বাক্যগুলোর মধ্যে জনতাকে উদ্বেলিত করার কোন অনুপান নেই। থাকবার কথাও নয়। আজ যে প্রতিটি শব্দই মেপে জোখে বলতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী পরিস্থিতি সামাল দিতে কী বলবেন সম্ভবত ঠিক করে উঠতে পারেন নি। এর উপর শুরু করেছেন বাংলায়। ভাগ্যিস! নিজের মাতৃভাষায় বললে শেষণ সাহেবের নির্দেশটি এত সহজে আমতা মামতা করে এড়িয়ে যেতে পারতেন না, যেমন পেরেছেন বাংলার উপর নির্ভর করে।

অতি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই গর্জে উঠল আকাশজানের ইঞ্জিন। অস্থায়ী হ্যালিপেডে রাশি রাশি ধূলি উড়িয়ে আকাশপথে রওয়ানা দিল প্রধানমন্ত্রীর বিমান, নীচে রইল যেন মহাভারতের হাজার রথচক্রের ধূলিতে আচ্ছাদিত যুদ্ধক্ষেত্র।

পড়ন্ত বিকেলে প্রিয় শিষ্যটিকে বাড়ির সীমানা দেওয়া বাঁশের বেড়া পর্যিন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসছেন প্রেমেন্দ্রমোহন। দূর থেকে ভেসে আসছে মগরিবের আজানের ধ্বনি-- শান্তির জন্য এসো, কল্যাণ্যের জন্য এসো—।

চোখের সামনে আবার ভেসে এল হারিয়ে যাওয়া গ্রাম, ধর্মদায়। ওখানেও শোনা যেত এমনি আজান। কেমন আছে ওই গ্রামের মানুষেরা? ওঁদের তো খবর দিতে হবে আমাদের এই প্রাপ্তির। কেমন আছে গ্রামের সেই ছোট্ট পাঠশালাটি যেখানে শিখেছেন তিনি অ-আ-ক-খ। কেমন আছে শৈশবের সেই সহপাঠীরা? সেই বটতলা, বাঁশঝাঁড়, কদম গাছ, যার নীচে বর্ষায় সাদা হয়ে পড়ে থাকতো গোলাকৃতি ফুলগুলো। কেমন আছে সেই বকুল গাছ, নোনা আতা আর শেয়াল কাঁটার ঘন বন? কেমন আছে সেই গ্রামে প্রহরে প্রহরে ডেকে ওঠা শেয়ালের দল? মুহূর্তে তিনি ফিরে গেলেন সেই হারানো বাংলায়। অঘ্রান মাসে ধর্মদা গ্রাম কি এবারও সেজে উঠেছে সোনালী ধানের আচ্ছাদনে? এখনো কি তাল গাছের সারিতে শীতের রাতে কাঁথা জড়িয়ে ঘুমোতে আসে বাংলার ভূতের দল?

হঠাৎ প্রেমেন্দ্রমোহনের বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে অনেক দিনের সঞ্চিত কান্না। তিনি যেন এই বরাক সুরমা ধলেশ্বরি পেরিয়ে ছুটে চলেছেন স্বকল্পিত এক অন্যভুবনের দিকে। নাকে আসছে অঘ্রানের চাতালে খড়পোড়া গন্ধ। কানে আসছে বাড়ির উঠোনে একজোড়া বলদ নিয়ে সারা রাত ধান

মাড়াইয়ের শব্দ। এত পরিপূর্ণতার মধ্যেও ভেতরের কান্না আর থামে না। এ কোথায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন? এটাই কি তাঁর সেই বাংলা যাকে তিনি বুকের ভেতর আজও লালন করে আসছেন? এই বাংলার মুখই আমি দেখি বরাকের করুণ ডাঙায়, এই তো আমার নির্বাসিতা ভূমি। একে ছেড়ে আর কোথায় যাবো, এটাই তো আমার ধর্মদা গ্রাম এরই বুকে একদিন আমি ঝরে যাব কোন এক দিন।

পড়ন্ত বিকেলে পশ্চিমের সূর্যরশ্মি দিগন্ত পেরিয়ে রক্তিম আভায় সবকিছু ভরে দিল ক্ষণেকের জন্য।

ধীর পায়ে প্রেমেন্দ্রমোহন এগিয়ে যাচ্ছেন বারান্দার দিকে। তাঁর ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে লাগল। (সমাপ্ত)

লেখক পরিচিতিঃ

সঞ্জীব দেবলস্কর (জন্ম ১৯৫৭)

শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, গল্পকার। শিলচর শহরের বাসিন্দা এ লেখক আসাম রাজ্যে বিপন্ন নাগরিকত্ব, বাংলা এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষার অধিকার এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতা নিয়ে চলমান আন্দোলনের একজন অরাজনৈতিক কর্মীও। প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে, 'কী ক'রে লিখব' (১৯৯৯), 'আজকের শ্রোতার বাংলা গান' (২০০৫), 'বরাক উত্যকার ইতিহাস ও সমাজ'(২০১১), 'শিক্ষার আলো আঁধারঃ এক ভিলেজ স্কুল মাস্টারের স্বীকারোক্তি ও অন্যান্য' (২০১৬), 'Portends of Disaster: Challenges before the linguistic minorities in Assam' (2011), Bengalis in Assam: Nationality Challenged (2018), What is Happening in Assam and Why'(2018)। সম্পাদিত গ্রন্থ,'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত' (২০০৬), শিলচর জেলা প্রশাসনের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত Coffee Table বই, Sesquicicetennial Souvenir (1857-2017)। আসাম সরকারের সাহিত্যিক পেনসনপ্রাপ্ত এ লেখকের গল্প 'ঝিমন সর্দার বাপের ব্যাটা' (২০১৪), 'ওই মহামানব হাসে'(২০১৭), 'লোহার শিকড়' (২০২০), 'লিরিল কন্যা' (২০২০), ছাড়াও 'The Broken Epitaph' (2020) পাঠকদের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

প্রকাশিতব্য উপন্যাস 'ষষ্ঠীতৎপুরুষ নামা' বর্তমানে যন্ত্রস্থ।

sanjib.deblaskar51@gmail.com